দ্বিতীয় অধ্যায়

মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্ব ॥

১.

সাহিত্যতত্ত্ব আর সাহিত্যের ব্যবহারিক সমালোচনা অন্যোন্য সম্পর্কবদ্ধ. নির্বিশেষ তত্ত্ব আর বিশেষের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ দুয়ের যৌগপত্যেই সমালোচনার পূর্ণ প্রকাশ। নির্বিশেষ তত্ত্ব দর্শন শাস্ত্রের বিষয় আর তত্ত্বহীন সমালোচনা বাতুলতা মাত্র। সাহিত্যের তত্ত্ব আর তার ব্যবহারিক প্রয়োগের মধ্যে যে লেখক স্বচ্ছন্দে গতায়াত করতে পারেন তাঁরই সমালোচনার অধিকার আছে। কাব্যের কী, কেন, কীসে ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে ব্যবহারিক সমালোচনাকেও উত্তর দিতে হয়, জানাতে হয় তুলনা প্রতি তুলনা কিংবা মূল্যাবধারণের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মতাদর্শ। আবার সাহিত্যের তত্ত্ব জিজ্ঞাসাকে বিশেষের ব্যবহারে করে তুলতে হয় বোধগম্য, যেমন করেছেন এ্যারিস্টটল। এই পারস্পরিক সম্বন্ধের তত্ত্ব সকলেই স্বীকার করেন পার্থক্যকে বলেন artificial; [১] আমরা রেনে ওয়েলেক এবং অস্টিন ওয়ারেনের লেখা থেকে একটু উদ্ধার করছি :

> ...literary theory is impossible except on the basis of a study of concrete literary works. Criteria, categories and schemes cannot be arrived at in vacuo. But conversely, no criticism or history is possible without some set of questions, some system of concepts some points of reference, some generalizations. There is here, of course, no unsurmountable dilemma : We always read with some pre-conception and we always change and modify these pre-conceptions upon further experience of literary works. This process is dialectical : a mutual interpenetration of theory and practice. [২]

সুতরাং মোহিতলালের ব্যবহারিক সমালোচনার তত্ত্বভিত্তিস্বরূপ তাঁর সাহিত্যাদর্শের কিছু সংবাদ নেওয়া জরুরি। বিশেষত তিনি সমালোচনার বিজ্ঞান গড়ে তোলবার জন্য প্রথম থেকেই উদ্যোগী হয়েছিলেন। ১৩২৬ এর ভারতীতে আর এর কিছু পরে প্রবাসী পত্রিকায় কাব্যতত্ত্ব বা Theory of poetry নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বাংলা ও ইংরাজী কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে সু-কাব্যের স্বরূপ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। অবশ্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এরকম নির্বিশেষ সমালোচনার উপযোগিতা নেই মনে করে তিনি 'নব্যভারত'-এ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা শুরু করেছিলেন। পরে সাহিত্য বিচার, সাহিত্য কথা গ্রন্থে এবং সাহিত্য বিতানের কোন কোন প্রবন্ধে সাহিত্যের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। মোটকথা সাহিত্যের তত্ত্ব ও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দুই ক্ষেত্রেই তাঁর সুচ্ছন্দ অধিষ্ঠান আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাহিত্য সমালোচকের পক্ষে যে রকম সচেতন সংবেদনশীল ও সংস্কৃতিমনস্ক পাঠক হয়ে ওঠা দরকার মোহিতলালের সে রকম রসগ্রাহিতা ছিল। সাহিত্যের রসগ্রাহিতায় তিনি পারঙ্গম, বিচারশীলতায় সতর্ক, রস সংস্কারণায় তাঁর দক্ষতা অপ্রতিহত। বহু পঠনের বৈদগ্ধ্য যেমন তাঁর সম্পদ তেমনি সম্পন্ন তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয়। ফলে সাহিত্যের তত্ত্বে যেমন তাঁর অধিকার তেমনি তার প্রয়োগেও। তবে একটা কথা বলাই উচিত, যাকে বলে নন্দনতত্ত্বের মৌলিক অধিকার সেরকম তাঁর কাছে পাই না আমরা। বরং বহুপঠনশীলতার ফলে বহু বিপরীত মতাদর্শেরও সমন্বয়ে একটি তত্ত্বমূর্তি তিনি গড়ে তুলতে পেরেছেন যা অন্যেরও নয় আবার তাঁরও নয় একথা বলা যাবে না। কিন্তু এ সকলের ভিতরে ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্যতাত্ত্বিক অবস্থান যা তার সমালোচনার তত্ত্বসূত্র।

২.

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্ত থেকে বাঙালী কবিদের কাব্য চিন্তার একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায়। তার আগে এখানে ওখানে দুটি একটি মন্তব্যে যা পাওয়া যায় তাকে কাব্যচিন্তা বলা দুষ্কর। ইংরেজি কাব্য সাহিত্য অনুশীলনের ফলেই আমাদের দেশে কাব্যচিন্তা গড়ে উঠলো। ইংরেজির মারফতে কেউ কেউ এ্যারিস্টটল পড়েছিলেন নিশ্চয়, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের শেক্সপীয়র ও পরবর্তী নব্যক্লাসিক কবিদেরও কিছু কিছু রোম্যান্টিক কাব্যতত্ত্বের চর্চাই

এদেশে বেশি হয়েছিল। বংকিম চন্দ্রের হাতেই যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা শুরু হল। তার আগে যা হয়েছে সে কেবল সকাল বেলার সলতে পাকানো।

বংকিম চন্দ্র অবশ্য সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে আলাদা করে কিছু লিখেননি। সাহিত্য কী, কবিত্ব কাকে বলে আর কীসে সাহিত্য হয় কীসে হয় না এসব নিয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেননি। প্রয়োজনে অন্যের উপর বরাত দিয়েছেন। কখনো কুণ্ঠার সঙ্গে কিছু বলেছেন। মাত্র পাঁচটি প্রবন্ধে ও বিষয়ে তাঁর মতাদর্শের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। বংকিম চন্দ্রের সাহিত্য তত্ত্বে "ঈষৎ রোমান্টিকতা মিশ্রিত ক্লাসিক পন্থা" এবং "যৎ সামান্য ক্লাসিক পন্থিতা মিশ্রিত রোমান্টিকতা"[৩] লক্ষ করেছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ রায়। এজন্য বংকিমের সাহিত্য চিন্তায় একই সঙ্গে ক্লাসিক অনুকরণবাদ এবং রোমান্টিক সৃষ্টিবাদের মিশ্রণ তিনি দেখতে পেয়েছেন। বংকিম সৃষ্টিক্ষমতার উপরে প্রথমাবধি গুরুত্ব দিয়েছেন; অনুকরণের চেয়ে সৃষ্টির মূল্যই তাঁর কাছে অধিক। উত্তরচরিতে তিনি সৃষ্টিক্ষমতাকেই কবির প্রধান গুণ বলে বর্ণনা করেছেন। যে কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী হয়েও স্বভাবাতিরিক্ত তাকেই তিনি প্রশংসা করেছেন। স্বভাবানুকারী অর্থে নিশ্চয় অনুকৃতি কিন্তু বংকিমের কাছে স্বভাবাতিরিক্ত-তার মর্যাদা অধিক। যথাচিত্র রচনাকে তিনি প্রশংসা করেন নি। দীনবন্ধুর প্রতিভার মূল্যায়ন করতে গিয়েও তিনি সৃষ্টি কৌশলের প্রশংসা করেছেন। তিনি অবশ্য সৃষ্টিক্ষমতার মধ্যে আবার কাল্পনিক সৃষ্টি শক্তির মহিমাই অধিক বলে মনে করেন। যথাদৃষ্ট বাস্তব আদর্শায়িত বাস্তব এবং কল্পনামূলক সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম ক্ষমতাটি ছিল, দীনবন্ধুর ছিল দ্বিতীয় ক্ষমতা এবং কালিদাস সেক্সপীয়রের তৃতীয় শক্তিটি যথেষ্ট পরিমানে ছিল। তাঁদের সৃষ্ট সৌন্দর্য প্রথম দুটির তুলনায় অধিক মনোহারী।

বংকিম সৌন্দর্য সৃষ্টিকে কাব্যের প্রধান গুণ মনে করেন কিন্তু তাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করেন নি। সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধিই তাঁর কাম্য। এজন্য সাহিত্যের কল্যাণমূল্য তিনি স্বীকার করেন। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি তিনি যে নিবেদন জ্ঞাপন করেছিলেন তার মধ্যে অর্থ যশ ইত্যাদির ভূমিকা অগ্রাহ্য হয়েছিল, অসত্য,

ধর্মবিরুদ্ধ, স্বার্থসাধনকর রচনা নিষিদ্ধ হয়েছিল আর দেশ বা মনুষ্যজাতির মঙ্গলের জন্য বা সৌন্দর্য সৃষ্টির কারণে সাহিত্যরচনার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। বংকিম এখানে সাহিত্যের সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষমতা ও তার হিতকারী ভূমিকা দুইই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। অবশ্য আরো পরে ধর্ম ও সাহিত্য প্রবন্ধে বংকিম সৃষ্টিবাদকে অস্বীকার করে তার হিতকারী ভূমিকাকেই বড়ো করে দেখিয়েছিলেন, বলে দিয়েছিলেন জগৎচিত্রের অনুকৃতিই উত্তম কাব্য কেননা ঈশ্বরের সৃষ্টির চেয়ে আর উত্তম সৃষ্টি কিছু নেই। বংকিমের এসব বিপরীত মন্তব্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত কোন সামঞ্জস্য পান না অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়। তাই তাঁকে আধা রোমান্টিক আধা ক্লাসিক বলে একটা সমাধানে উপস্থিত হতে চান। আমরা লক্ষ করি তাঁর সাহিত্যচিন্তা সৌন্দর্য সৃষ্টি আর লোককল্যাণ দুয়ের মধ্যে একটা সংযোগ রক্ষা করে চলেছে। বংকিম চিত্তশুদ্ধির কথা নানা প্রসঙ্গে বলেছেন। ধর্মের চিত্তশুদ্ধি হয়তো বংকিমের কাংক্ষিত, কিন্তু ভারতীয় কাব্যতত্ত্বের সাধারণীকরণ আর পাশ্চাত্যের ক্যাথারসিস একই চিত্তশুদ্ধির রূপান্তর। এ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিসের শুদ্ধিচেতনার মূলে ধর্মীয় ধারণা অস্বীকার করা যায় কি ? ভারতীয় সাধারণীকরণের সাক্ষাৎ ফল চিদগদ আবরণভঙ্গ। এর অর্থ বিশিষ্টের অভিমান লোপ। এরই ফল মনুষ্যেপ্রীতি। এ্যারিস্টটলের ক্যাথারসিসতত্ত্বকেও বুচার ব্যক্তিসত্ত্বের গন্ডি অতিক্রম করে বিশ্বাত্মবোধে উজ্জীবিত হবার অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। সেজন্যই কি বংকিমের কাছে সাহিত্য ধর্মের সোপান ?

৩.

বংকিমের সাহিত্যচিন্তা পেরিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে আমরা পেলাম সাহিত্যতত্ত্ব। বংকিমের মন তত্ত্ববিমুখ, রবীন্দ্রনাথের মন তত্ত্বসন্ধানী। সাহিত্যের নির্বিশেষতত্ত্ব প্রতিষ্ঠায় বংকিমের আগ্রহ ছিল না, অন্যদিকে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তথ্যরাশির অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটুকু আবিষ্কার করাতেই রবীন্দ্রনাথের সমধিক আগ্রহ। তিনি নিজের জগৎ ও জীবনবীক্ষার উপরে নির্ভর করে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। তাঁর সাহিত্য চিন্তার পরিধিও বহু বিস্তৃত। প্রায় সাতটি দশক জুড়ে লেখা এই প্রবন্ধাবলীতে তাঁর চিন্তার পরিচ্ছন্নতা ও স্পষ্টতা দেখা দিয়েছে ক্রমশ, কিন্তু সমস্ত লেখার মধ্যে চিন্তার একটি ঐক্য সর্বদা বিদ্যমান। জীবনের শেষ চল্লিশ বছরে

লেখা তিনটি বাংলা প্রবন্ধ গ্রন্থ - সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, এবং সাহিত্যের স্বরূপ -এ এবং দুটি ইংরেজি রচনা The Religion of Man এবং The Religion of An Artist - গ্রন্থে তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব বিষয়ক ধারনার পরিচয় আছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা মূলত রোমান্টিক। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ রায় তাঁর রোম্যান্টিক আদর্শে পাশ্চাত্য থেকে ভারতীয় উপনিষদিক চিন্তার দিকে যাত্রা লক্ষ করেছেন, এবং এও ঠিক যে শেষ বয়সে তিনি বিশশতকীয় আধুনিক সাহিত্য চিন্তার কাছাকাছি এসে গিয়েছিলেন। তবু তাঁর সাহিত্য তত্ত্বে সৃজনশীল কল্পনার অসামান্যতা, অনুভূতির গুরুত্ব অনুকরণবাদ অস্বীকার করে সৃষ্টি মহিমা সম্প্রচার, প্রকাশবাদ ও লীলাবাদের গুরুত্ব এবং রোমান্টিক ঐক্যতত্ত্ব রোমান্টিকতার অনপনেয় চিহ্নরূপে বিদ্যমান।

সৌন্দর্য রচনাই প্রথমাবধি রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, লোকেন পালিতের সঙ্গে পত্রালোচনায় তা মানব প্রকাশের উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হয়েছে। সত্য তাঁর কাছে অনুভূতিলব্ধ জগচ্চিত্রের উপস্থাপনায় নয় ভাবুকের উপলব্ধিতেই তা বিরাজমান। তবু সাহিত্যে যে জগচ্চিত্রের মহিমা, সাহিত্যের পথে গ্রন্থে তাও খন্ডিত এবং সেখানকার আদর্শ ব্যক্তির উপলব্ধির গভীরতা। সাহিত্যের বিষয় আর জ্ঞানের বিষয়কে তিনি প্রথমাবধি পৃথক করে রাখেনি এবং সাহিত্যের সত্যতা তাঁর কাছে বিষয়ের যথার্থ্যে নয় মানুষের আপন উপলব্ধিতে।[৪] আইনস্টাইনের সঙ্গে কথোপকথনেও তিনি human truth এর কথা বলেছিলেন। এই উপলব্ধির সঙ্গে যুক্ত তাঁর আনন্দবাদ। এই উপলব্ধির পথে রবীন্দ্রনাথ সুখ দুঃখ সুন্দর অসুন্দরের কোন পার্থক্য রাখেননি। "আমি যে আমি এইটে খুব করে যাতেই উপলব্ধি করায় তাতেই আনন্দ"।[৫] দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর কেননা সেটা অস্মিতাসূচক"।[৬] রবীন্দ্রনাথের কাছে অনুভূতিহীন অসাড়তাই নাস্তিত্ব। অনুভব যত তীব্র আত্মোপলব্ধিও তত উজ্জ্বল। চারিদিকের রসহীনতায় চৈতন্যে যখন সাড় থাকেনা তখন সেই অস্পষ্টতাই দুঃখকর কেননা তখন আত্মোপলব্ধি ম্লান।[৭] এই অনুভূতির তত্ত্বে বিশ্বাস

থেকে রবীন্দ্রনাথ : বললেন মানুষ যাকে অন্তর থেকে অনুভব করে তাই সত্য।

> ইংরেজিতে যাকে বলে **real** সাহিত্যে আর্টে সেটা হচ্ছে তাই যাকে মানুষ আপন অন্তর থেকে অব্যবহিতভাবে স্বীকার করতে বাধ্য। তর্কের দ্বারা নয় প্রমাণের দ্বারা নয় একান্ত উপলব্ধির দ্বারা।[৮]

বাস্তব প্রবন্ধেও এই উপলব্ধির সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তিনি। সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থেও বললেন :

> সত্যে তখনই সৌন্দর্যের রস পাই অন্তরের মধ্যে যখন পাই তার নিবিড় উপলব্ধি জ্ঞানে নয় স্বীকৃতিতে। তাকেই বলি বাস্তব।[৯]

এ সবের মধ্যে দেখতে পাই জগতের যে গুরুত্ব অন্তত সাহিত্য গ্রন্থের সাহিত্যের বিচারক প্রবন্ধেও স্বীকৃত হয়েছিল এখানে তা খন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য মাঝে একবার আধুনিক কাব্য প্রবন্ধে কাব্যে বিষয়ের গুরুত্বও স্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন " নিরাসক্ত-চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে "[১০] দেখবার শাশ্বতভাবে আধুনিকতার কথা. আর্টেও সায়েন্সের মত নিরাসক্ত-মনের গুরুত্ব মেনে নিয়েছিলেন কিন্তু সাহিত্যের স্বরূপ গ্রন্থে তাকেও অস্বীকার করেছেন।

> বাস্তবই হচ্ছে মানুষের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে নিজের বাছাই করা জিনিস। নির্বিশেষে বিজ্ঞানে সমান মূল্য পায় যা-তা। সেই বিশ্বব্যাপী যা-তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে এসে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব।[১১]

সাহিত্যের কল্যানমূল্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রায় নীরব। তিনি প্রথমাবধি সাহিত্যকে উদ্দেশ্যহীন প্রতিপন্ন করবার পক্ষপাতী. তিনি বলে " সাহিত্যই সাহিত্যের উদ্দেশ্য "।[১২] সাহিত্যের মঙ্গলমূল্যের চেয়ে আনন্দমূল্যের গুরুত্ব তাঁর কাছে অনেক বেশি. বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত-করাই তাঁর কাছে সাহিত্যের উদ্দেশ্য। আর সে আনন্দ সত্যের নিবিড় উপলব্ধিতে আত্মসংবিতের

জাগরণের মধ্যেই লভ্য। তবু সাহিত্য গ্রন্থের সৌন্দর্যবোধ প্রবন্ধে সুন্দর ও মঙ্গলের ঐক্যবিধান হয়েছিল সৌন্দর্যমূর্তি ও মঙ্গলমূর্তির একটা সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন তিনি। কিন্তু সাহিত্যের পথে গ্রন্থের বাস্তব প্রবন্ধে কল্যাণ উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করাই সাহিত্য। তবু সাহিত্যের কল্যাণমূল্য তাত্ত্বিকভাবে অস্বীকৃত হয়নি। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে কুমার সম্ভবে "সমস্ত প্রেমের বেগ মঙ্গলমিলনে পরিসমাপ্ত" [১৩] দেখেছিলেন, শকুন্তলার মধ্যেও নিতান্ত আত্মগত প্রেমকে শেষ পর্যন্ত সংসারের মধ্যে মঙ্গলমাধুর্যে বিকীর্ণ হয়ে সার্থক হতে দেখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যের নামই সামঞ্জস্য। তাই তাঁর কাছে কল্যাণেরও নামান্তর। কিন্তু এই কল্যাণ সাহিত্যনীতির অন্তর্গত সমাজনীতির নয়। রোমান্টিক সাহিত্যের এই অন্তর্নিহিত কল্যাণবোধ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বেরও অন্তর্গত কিন্তু সাহিত্যের সবশেষের কথা তাঁর কাছে আনন্দ।

বাংলা সাহিত্যে এই তাত্ত্বিক পটভূমিকায় মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গোপস্থাপন করতে হবে।

৪.

মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্বে সত্য শিব সুন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি নিজের নাম নির্বাচনের স্বাধীনতা নিয়ে হয়েছিলেন সত্য সুন্দর দাস, সচেতনভাবে একটি আইডিয়া কে মনে রেখে তাঁর জীবন পরিচালিত হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত এই আইডিয়াই হয়ে উঠেছিল তার জীবনেরও নিয়ন্ত্রক শক্তি, যারই ফলে তাঁর জীবনের মিত্রলাভ থেকে মিত্রভেদ পর্যন্ত হয়েছিলো, নিঃসঙ্গতার নিঃসীম গ্লানিতে তাঁর জীবনের অন্তিম দিনগুলি অপগত হয়েছিল, আর মনোক্লিষ্টতার সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেও তিনি বিস্মৃত হননি তাঁর স্বেচ্ছাবৃত নামটির দায়িত্ব।

ভারতী পত্রিকায় মাসকাবারি কলমে মোহিতলাল যখন সত্য শিব সুন্দর সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেছিলেন, সেই ১৩২৬ সালে, বাংলায় সৌন্দর্যদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ লেখালেখি হয়নি।

সে সময় মোহিতলাল নিজের আত্মপ্রত্যয় ও কাব্যবোধের উপর নির্ভর করে এরকম আলোচনা শুরু করেছিলেন। তিনি এ লেখাগুলিকে অবশ্য Philosophy of Art বলতে চাননি যদিও এগুলি আসলে তাই-ই, এবং পরবর্তীকালে তিনি একে নির্বিশেষ তত্ত্বচর্চা[১৪] বলে অভিহিত করেছেন। ১৩২৬ সালের পৌষ সংখ্যা থেকে চৈত্র সংখ্যা পর্যন্ত ভারতী পত্রিকায় যে শিরোনামে[১৫] তিনি বিষয়টিকে দেখাচ্ছিলেন তাতেই বোঝা যায় তাঁর মূল অন্বেষা ছিল সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং রসতত্ত্বের সঙ্গে সৌন্দর্যতত্ত্বের সম্পর্ক নির্ণয়। এ সব লেখায় তিনি প্রাচ্য রসতত্ত্ব ও পাশ্চাত্য সৌন্দর্য-তত্ত্বের মীমাংসাগুলি অনুসরণ করেছিলেন, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক হেগেল, হার্বার্ট স্পেন্সার, বোম-গার্টেনের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থ কীটস প্রমুখের কাব্যাদর্শ অনুসরণ করেছেন, টলস্টয় ম্যাথু আর্নল্ড, ইবসেন, মেটারলিংক প্রমুখের চিন্তাও তাঁর লেখায় লক্ষ করা যায়। এ সব লেখায় মোহিতলালের বহুপঠনশীলতা আছে মনস্বিতা আছে, তিনি নিজে তত্ত্বালোচনায় আনন্দও পেতেন, এখন আমরা Theoretical mind বলতে যা বুঝি মোহিতলালের মন তা-ই ছিলো। তবু যেন পাণ্ডিত্যের ভার তাঁর মণীষার ক্ষুরধার দ্যুতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। এসব লেখার মূল প্রসঙ্গ সৌন্দর্য, সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্যের ও মঙ্গলের সম্বন্ধ নিরূপণ, সৌন্দর্য ও রসের সম্পর্ক এবং রস ও সৌন্দর্যোপভোগে অধিকারীভেদ সম্পর্কে আলোচনা।

৫.

সৌন্দর্য বিষয়ে এসব লেখায় মোহিতলালের ধারণা খুব পরিষ্কার হয়েছে এমন নয়। তবু সৌন্দর্যচিন্তার নানা মতবাদের বৈপরীত্যের মধ্যে তাঁর সৌন্দর্যবোধের গোত্র চিহ্নটি লক্ষ করতে পারা যায়। তাঁর লেখায় soul এর গুরুত্ব, অনুভূতির মূল্য সচেতনতা সৌন্দর্যের সমগ্রতার ও সমন্বয়ের তত্ত্ব, এবং সৌন্দর্যকে জড়াতিরিক্ত মহাচেতনার অংশ বলে স্বীকার করবার মধ্যে তাঁর রোমান্টিক পরিচয় নিহিত আছে। মোহিতলালের মনে প্রথমাবধি রোমান্টিক ও ক্লাসিক চিন্তার যৌগপত্য ছিল। সৌন্দর্যকে যেমনটি তিনি অনুভববেদ্য বলেন তেমনি তাকে রূপ-নির্মিতির অঙ্গীভূত করেও প্রকাশ করেন।[১৬] সুন্দর ও সুন্দরানুভূতি অবশ্য অন্যোন্য পরতন্ত্র, কেবল আত্মানুভূতি নয়, এবং এই বিষয় বিষয়ী সংযোগে উৎপন্ন সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে পরাতত্ত্বকেও

উপলব্ধি করা যায়। মোহিতলালের মতে যা কিছু আহ্লাদিত করে তাই সুন্দর।[১৭] এই সুন্দর ভোগমূলক বা ইন্দ্রিয়গত এবং উপভোগমূলক বা অনুভাবাত্মক।[১৮] মাঘ সংখ্যায় তিনি লিখেছিলেন সুন্দরের স্পর্শে মানুষের মনে তিনটি অনুভূতির উদয় হয়, কারো মনে নিম্নশ্রেণীর ইন্দ্রিয় কামনা জাগে, উচ্চতর প্রকৃতিতে তা নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতকামনার উদ্রেক করে এবং উচ্চতম প্রকৃতিতে তা চিত্তের সর্ববিরোধের সামঞ্জস্য বিধান করে সৌন্দর্যবোধের চরম সার্থকতা সম্পাদন করে। এই সুন্দর যে আনন্দের সংস্কার করে তা থেকেই আর্টের জন্ম, আবার যে রস সংস্কার করে তা থেকেই ভক্তি ও প্রেমের উদ্ভব।[১৯]

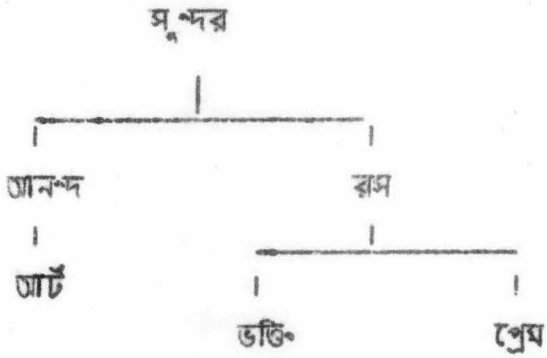

এদিক থেকে সুন্দরই সব শিল্প ও ধর্মের মূল উৎস। একথার সমর্থন অন্যভাবেও তাঁর লেখা থেকে পাই। পৌষ সংখ্যায় মাসকাবারি কলমে সত্য শিব সুন্দর তত্ত্ব উপস্থাপন করে তিনি বলেছিলেন সত্য হচ্ছে মূল আর সৌন্দর্য হচ্ছে তারই বিচিত্র বিকাশ। এই মূলতত্ত্বটিকে মনে করি Plato র আইডিয়ার অনুরূপ আর সেই Ideaর একটি প্রকাশ আনন্দে অন্য প্রকাশ রসে। সুন্দর সম্বন্ধে চৈত্র সংখ্যার ভারতীতে তিনি লিখলেন সুন্দর " ইন্দ্রিয় ভোগমূলক নয় মানসিক উপভোগ"মূলক, তা "বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হলেও" সেই বস্তুগুলির সঙ্গে "বাস্তব সম্বন্ধ শূন্য"[২০]। ফাল্গুন সংখ্যায় আগেই লিখেছিলেন "সুন্দর অজ্ঞাপ্য অনির্বচনীয় নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত, সহৃদয় হৃদয়বেদ্য"[২১] এবং এই সুন্দর বস্তুর পরিচয়ে আমাদের মন একটা "বৃহত্তর অসীম অবাস্তব অনুভূতি বশে চঞ্চল"[২২] হয়। তখন আর যে বস্তুর নির্ভরতায় সৌন্দর্যবোধের উদ্ভব তার কথা মনে থাকে না। কিন্তু এই সত্য সুন্দরকে দেখতে হলে চাই একই কালে আত্মস্থ ও আত্মনির্লিপ্ত থাকার ক্ষমতা subjective ও objective এর মিলিত দিব্যসৃষ্টি,[২৩] নতুবা তার দর্শন সম্ভব নয়।

৬.

ভারতীয় পৌষ সংখ্যায় মোহিতলাল সত্য শিব সুন্দরের মূলতত্ত্বটি উপস্থাপন করে বলেছিলেন সত্য হচ্ছে মূলগতশক্তি আর সৌন্দর্য হচ্ছে তারই বিচিত্র বিকাশ। তাঁর কথায় যদিও স্পষ্ট নয় তবু ধারনা হয় এই মূলগত সত্যের উপরে বিরাজিত বিচিত্ররূপের অন্তর্বর্তী সামঞ্জস্যই হল মঙ্গল। প্রাচীনকালে সত্য ও মঙ্গলের ধারণাই ছিল মুখ্য, এখন সত্যের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা মূল সত্যকে হারিয়ে ফেলেছি আর তার মঙ্গলমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা সংশয়। এ যুগের বিজ্ঞান আর দর্শনের অন্বেষণে সত্যকে পাওয়া যাচ্ছে না, মোহিতলাল মনে করেন আর্টেই তাকে পাওয়া সম্ভব, আর্টের মধ্যে মঙ্গল অমঙ্গল পাপপুণ্য সুশ্রীকুশ্রী সব সত্য সুন্দরের সমন্বয় রসে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। মোহিতলালের ধারণায় যে সত্যকে এখানে উপস্থিত হতে দেখি তা বস্তু সম্পর্কহীন আইডিয়া। মাঘ সংখ্যায় তিনি "সুন্দরকেই সত্য বলে উপলব্ধি"[২৪] করার কথা বলেন, আদর্শকে বলেন ভগবানেরই প্রতিরূপ (মোহিতলালের ব্যবহৃত বাক্যবন্ধ "আদর্শ বা ভগবান")[২৫], সৌন্দর্যমূর্তি ও মঙ্গলমূর্তিতেই তার রূপ বিকাশ। মাঘ সংখ্যার লেখায় আইডিয়া আর ঈশ্বরের এই ঐক্য দেখে মনে হয় মোহিতলাল যেন পরা-সত্তাভিত্তিক সৌন্দর্যের কথা মনে রেখেছেন, সৌন্দর্য ঈশ্বরেরই অনির্বচনীয় পরমসত্তার অভিব্যক্তি-এর একটি প্রকাশ আর্টে অন্য প্রকাশ ধর্মে,কেননা মানুষের ধর্মচেতনার মূলেও আছে সুন্দরের বশ্যতা।[২৬]

মঙ্গলের সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক তাঁর তত্ত্বে ওতপ্রোত, মঙ্গল সত্যেরই প্রকাশ। "তার সুন্দর সত্যেরই রূপ - সম্পূর্ণ অদুষ্টিত, তার মধ্যে অমঙ্গলের কল্পনাও থাকতে পারে না।"[২৭] কিন্তু সে প্রকাশ বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যে। মোহিতলালের লেখায় সত্য ও মঙ্গলের সম্বন্ধে আলোচনা অবশ্য খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু সুন্দরের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত প্রকাশ যে হয় তা তিনি জানেন। তাই দেখি তিনি বলেন আধুনিক মানব মন সত্য ও মঙ্গলকে সুন্দরের মধ্যে দিয়ে পাবে।[২৮] কখনো কখনো তিনি বলেন মঙ্গলের উপর অধিক গুরুত্বের জন্য সুন্দর খন্ডিত হয় সুন্দরও মঙ্গলের আড়ালে লুপ্ত হয়ে যায়।[২৯] অবশ্য তাঁর মতে এই মঙ্গল জাগতিক প্রয়োজন মেটায় না

জাগতিক প্রয়োজন বরং সত্যসুন্দরকে খন্ডিত করে। মঙ্গলমূর্তি বড় হয়ে উঠে তার মূল সত্যের সৌন্দর্যকেই অবমিত করে।

মোহিতলালের সুন্দর তত্ত্ব সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য কেবল অনুভব বেদ্য এবং সর্ববিরোধের সামঞ্জস্যের মধ্যে আছে তাঁর প্রকাশ। আর এই সামঞ্জস্যে সুন্দর অসুন্দরের কোন ভেদবুদ্ধি থাকে না কিন্তু সামঞ্জস্যের অভাবে সুন্দর অসুন্দরের বিরোধেই মানুষের মঙ্গলকামনা জাগ্রত হয়।[৩০] মোহিতলালের এই পর্বের চারটি লেখাতেই এই সামঞ্জস্যের তত্ত্ব নানা ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। পৌষ সংখ্যায় তিনি সব বৈপরীত্যকে সত্যসুন্দরের সমন্বয় রসে ঐক্যময়[৩১] করবার কথা বলেছিলেন, মাঘ সংখ্যায়ও বললেন সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব এড়াতে পারলেই চিত্তে সৌন্দর্যের চরম অভিব্যক্তি ঘটে[৩২], পরেও বললেন সৌন্দর্য দর্শন হল সমগ্র-ভাবে দেখা "সবটাকে একসঙ্গে একেবারে না দেখতে পারলে সুন্দর মূর্তি দেখা হয় না।"[৩৩] এই সমগ্ররূপ দর্শন বুদ্ধির দ্বারা হয় না soul ই তা পারে। সৌন্দর্য উপলব্ধির জন্য talent নয় soul ই আসল "[৩৪] কেননা তাঁর মতে soul এর মধ্যে জ্ঞানবৃত্তি চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তির একটা সমাহার জনিত আশ্চর্য অখন্ড বোধশক্তি আছে। এই সমগ্রতার ধারনা-রবীন্দ্রনাথের মতো - তাঁরও সৌন্দর্যতত্ত্বের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য যা পাশ্চাত্য সৌন্দর্যতত্ত্ব থেকে জ্ঞানবৃত্তি মারফত তিনি পেয়ে থাকবেন। কেবল সুন্দরই তার কাছে সামঞ্জস্যমূলক নয় সত্যও সামঞ্জস্যমূলক দেহচেতনা হৃদয়বেদনা ও মানস ক্রিয়ার পূর্ণ সামঞ্জস্যেই সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব।

৭.

মোহিতলালের এ সব লেখায় সৌন্দর্যের তত্ত্বমূর্তি তাও যেন পরিচ্ছন্ন হয়নি। তিনি একাধিক সৌন্দর্যবিষয়ক ধারনাকে এই প্রবন্ধগুলিতে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি রোমান্টিক ভাববাদী সত্য-তত্ত্বের সঙ্গে ক্ল্যাসিক রূপ নির্মিতিকেও মিশিয়ে দিয়েছেন। ভাববাদীদের মতে সুন্দরই সত্যবস্তু তিনি স্বয়ং প্রকাশ সত্য শিব সুন্দরের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। শেষ পর্যন্ত এই তত্ত্বই তাঁর লেখায়

গ্রাহ্য হয়েছে। ভারতীয় দর্শনে এবং রসতত্ত্বে তাঁকে বলা হয়েছে 'রসস্বরূপ'। মোহিতলাল এই রসকে সুন্দর অনুভবের উপায় বলে বর্ণনা করেছেন। এর সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন এ্যারিস্টটল কথিত রূপনির্মিতির তত্ত্ব। ক্লাসিক রূপনির্মিতির তত্ত্বে বস্তুর সমগ্ররূপ দর্শনেই সৌন্দর্য কিন্তু রোমান্টিকদের সমগ্রতা হল চিত্তে প্রতিফলিত সত্যের মূর্তি - তাঁদের কাছে reality মাত্রই subjective. মোহিতলালের পক্ষপাত এখানে রোমান্টিকদের দিকে সৌন্দর্য তাঁর কাছে "জড়াতিরিক্ত মহাচেতনার স্ফূর্তি।"[৩৫] বাস্তবের সত্যকে পরিত্যাগ করে তিনি imagination-এর সাহায্যে সুন্দরের রূপভেদ করবার যে বক্তব্য উপস্থাপন করেন তাও রোমান্টিক গোত্রাংকিত।

৮.

প্রবাসীর কাব্যকথা থেকে মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্বের চর্চা শুরু হল। Aesthetics এর সূত্রধরে কবিপ্রেরণার বা রসসৃষ্টির বিশিষ্ট লক্ষণ নির্ণয় করা যায় না বলে তিনি অতঃপর নন্দনতত্ত্ব ছেড়ে কাব্যতত্ত্বকেই অবলম্বন করলেন।[৩৬]

মোহিতলাল শিল্প-সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনায় ভাববাদী : কাব্যতত্ত্বালোচনায়ও ভাববাদী সাহিত্য চিন্তায় অনুপ্রেরণাবাদকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। প্রতিভা ঈশ্বরদত্ত, কবিরা ঈশ্বরভাবাবেশে কাব্যরচনা করেন। 'যমেবৈষবৃণুতে' তিনিই কাব্যরচনার অধিকারী। দিব্যোন্মাদনা ব্যতীত কাব্যরচনা অসম্ভব। দিব্যোন্মাদনার মুহূর্তে কবিরা ঈশ্বরের বাণীই উচ্চারণ করেন। প্লেটোর সময় থেকেই এ ধারণা আমরা পেয়ে আসছি। মোহিতলাল কবিপ্রতিভার এই প্রেরণাবাদী ধারণাকে কাব্যালোচনার প্রথমসূত্র হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন। কবি ও কাব্য প্রবন্ধে তিনি বললেন :

> যিনি কাব্য রচনা করেন, কবি বলিতে সেই মানুষটিকে বুঝিব না, সেই মানুষটির মধ্যে যে আর একটি মানুষ আছে কাব্য রচনাকালে যে আত্মপ্রকাশ করে অথবা আর একটি যে আত্মা যেন তার উপরে ভর করে সেই অপর ব্যক্তি বা আত্মাকেই কবি বলিয়া বুঝিব।[৩৭]

মোহিতলালের লেখায় আমরা সৃজনশীল কল্পনার গুরুত্ব লক্ষ করি, কিন্তু সে কল্পনা দৈবী প্রেরণার অনুগত। এই দৈবী প্রেরণাই তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি। তিনি বলেন :

> যে দৈবী প্রেরণা বশে সেই কল্পনা কাব্যসৃষ্টিতে রূপময়ী হইয়া উঠে সে প্রেরণা সকলের ভাগ্যে ঘটেনা, যাহার ভাগ্যে ঘটে সেই ভাগ্যবানই বাণীর বরপুত্র, তিনিই কবি।[৩৮]

এই প্রেরণা স্বীকার করে নেবার ফলে তাঁকে কবির ব্যক্তি-সত্তা ও কবিসত্তার দ্বৈততা স্বীকার করতে হল। ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে কবি মানুষের পার্থক্য নির্দেশ করে তিনি বললেন :

> কবি জীবনে এই দ্বৈত আছে। কাব্যের মধ্যে যাঁহাকে পাই আর সমাজ সংসারে যাঁহাকে পাই তাঁহার মূর্তি এক নহে।[৩৯]

এই পার্থক্য স্বীকার করবার ফলে কাব্য রচনায় কবির পরিপার্শ্ব অস্বীকৃত হল। লিরিক কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেও ব্যক্তি-জীবনের কথা থাকে না, থাকে আদর্শ কল্পনার আবেগ। কাব্য রচনাকালে কবির মনে একটি বৃহত্তর চৈতনার আবেশে "কল্পনার যে দিব্যোন্মাদ ঘটে"[৪০] তাতেই কবি সাধারণ জীবনের উর্ধ্বে উঠে যান। ব্যক্তির জীবনের ক্ষুদ্রতা এক মহত্তর সত্তার মধ্যে ডুবে যায়, কবির অহংমুক্তি—তাঁর নবজন্ম হয়। এ অবস্থাকে মোহিতলাল বলেন প্রকৃত রসানুভূতির অবস্থা। এ অবস্থায় কোন বিরোধ বা দ্বন্দ্ব থাকে না জ্ঞানী ও জ্ঞেয়ের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না।[৪১] ভারতী পর্বে তিনি সর্ববিরোধের সামঞ্জস্যের দ্বারা সৌন্দর্যবোধের যে ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন এও সেই ধারণা। এর পিছনে প্লেটো কিংবা প্লোটিনিউর harmony তত্ত্ব কিংবা রবীন্দ্রনাথের অখন্ডতা তত্ত্ব প্রভাবশীল আছে বলে মনে করি। প্লেটো জগৎকে আইডিয়ারই অভিব্যক্তি বলে ভেবেছিলেন। মোহিতলাল পৌষের ভারতীতে বলেছিলেন সত্যই নানা বৈচিত্র্যের শত তরঙ্গ ভঙ্গে প্রকাশিত হয়ে তার ভিতরের ঐক্যটিকে হারিয়ে ফেলেছে। কেবল আর্টই তাকে সুষম করে প্রকাশ করতে পারে। এখন কাব্য ও জীবন প্রবন্ধে সেই বিভঙ্গ প্রকাশের কথা বললেন আবার :

> জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে যে সত্য সুন্দরের প্রতিবিম্ব শতখণ্ড দর্পণে ভগ্ন ও অসংলগ্নভাবে বিকীর্ণ হইয়া আছে অতি চঞ্চল ঊর্মি-বন্ধুর নদীবক্ষে চন্দ্র কিরণের ন্যায় যাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিতেছে না তাহারই একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি কবি-কল্পনায় ধরা পড়ে।[৪২]

কবির কাজ সেই ভগ্ন প্রতিবিম্বকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে প্রকাশ করা। সৃজনশীল কল্পনা এই কাজের অধিকারী। কিন্তু এরই পাশাপাশি তিনি দৈব আশ্রয় ত্যাগ করেন নি। ঐ একই প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> মানুষ আপনার কল্পনাবলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক তাহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক তাহার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে তাহা হইলে এমন একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয় যাহার জন্য মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে, সে কাব্য সত্য-কার বেদনা আশ্বাস ও সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে না।[৪৩]

এর মধ্যে যেন সত্যসুন্দর অর্থে ঈশ্বরের বা সেই পরমের একটা ইঙ্গিত শোনা যায়, বিশেষত যখন ভারতীতে বলাতাঁর কিছু বাক্যবন্ধ মনে পড়ে যেখানে তিনি সত্যের মূর্তির সঙ্গে সৌন্দর্যের একরূপতা প্রদর্শন করেছেন। কাব্যের প্রেরণাও এই সত্যসুন্দরের দ্বারা উদ্দীপিত,কেননা তাঁর কথায় :

> যে কাব্যে সত্যসুন্দরের বোধ এমন করিয়া জাগে না সে কাব্যের প্রেরণা অসম্পূর্ণ বুঝিতে হইবে।[৪৪]

এর মূলে আছে হয়তো সেই পরমের অনুপ্রেরণা। একে আরো স্পষ্ট করে চিনতে পারি নিত্য ও সাহিত্য প্রবন্ধে সেখানে তিনি মনে করেন এক নিত্য শাশ্বত পুরুষই কাব্যের বর্ণনীয়। তবে এই নিত্য ঠিক ঈশ্বর নয় কেননা যুগে যুগে মানবজীবনের ভিতর দিয়ে প্রবহমান এক নির্বিশেষ সত্তাই সেখানে নিত্য পুরুষ হিসেবে ব্যঞ্জিত। তবু নানা দিক থেকে দৈব প্রেরণাবাদ মোহিত লালের কাব্যতত্ত্বের বড়ো দিক।

১০

কাব্যতত্ত্বে কল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রাচীন কাব্যতাত্ত্বিকেরা অবশ্য কল্পনাবৃত্তির উল্লেখ করেননি। গ্রীস দেশে কিংবা প্রাচীন ভারতবর্ষে অনুকৃতিকেই কাব্যরচনার মূলভঙ্গি বলে মনে করা হত। কল্পনাবৃত্তিকে রোমান্টিকেরাই সৃজন ক্রিয়ার মৌল বৃত্তি বলে তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রে কান্ট কল্পনা শক্তির ত্রিবিধ রূপাবিষ্কার করলেন এবং তা বিশেষত কোলরীজের হাতে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের মৌল উপাদান হিসেবে বিশিষ্ট হয়ে উঠলো। আমরা যে সামঞ্জস্য তত্ত্বের কথা মোহিতলালের লেখায় পেয়েছি তা রোমান্টিক ইমাজিনেশনেরই একটি শক্তি। রবীন্দ্রনাথ কল্পনাশক্তির মধ্যে এই ঐক্যের শক্তিকেই দেখেছিলেন। মোহিতলালকে তা প্রভাবিত করে থাকবে।

Imagination ও **Fancy** নামে কোলরীজ কল্পনাবৃত্তির যে দুই রূপ অনুধাবন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তাদের নাম দিয়েছিলেন কল্পনা ও কাল্পনিকতা। মোহিতলাল কল্পনা অর্থে **Imagination**-কেই গ্রহণ করেছেন, সাহিত্য ও জীবন প্রবন্ধে **Fancy** কে বলেছেন "মনের খেয়াল খুশীর একরূপ যাদুশক্তি", [৪৫] জগৎ ও জীবনকে তেমন স্থির ও গভীর দৃষ্টিতে যার দেখবার ক্ষমতা নেই। কল্পনা বলতে তিনি কবির সৃষ্টি শক্তিকেই বুঝিয়েছেন :

> "আমরা কবির সেই সৃষ্টি শক্তির নাম দিয়াছি কল্পনা। যে শক্তির বলে কবি এই একটা জীবনকে গভীরতর সত্যরূপে আমাদের হৃদগোচর করেন, সেই সৃষ্টি শক্তির মধ্যেই আমরা জীবনকে আরও সুসঙ্গত ও সুসম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাই। কল্পনা বলিতে একাধারে সেই দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি।" [৪৬]

কল্পনার আভ্যন্তরীণ সৃষ্টি শক্তিকে ব্যাখ্যা করে মোহিতলাল কবি ও কাব্য প্রবন্ধে লিখেছেন :

> ভিতরের বা বাহিরের যে কোন বস্তু বা তথ্যকে একরূপ ভাবদৃষ্টির সাহায্যে অভিনব আকারে প্রকটিত করার যে কবিবৃত্তি - তাহারই নাম কল্পনা, ইহাই কবির কাব্য প্রতিভা। [৪৭]

সৃষ্টি শক্তি, মোহিতলালের মতে - একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত অনুভূতিকে যথাযথভাবে বাঙময় করবার ক্ষমতা - এবং সাহিত্য ও জীবন প্রবন্ধে তিনি এই সৃষ্টিক্রিয়ার উপরে গুরুত্ব দিয়ে বললেন জগৎ ও জীবনকে বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নরূপে না দেখে সুসম্পূর্ণরূপে দেখবার দৃষ্টিশক্তির নামই কল্পনা। এই কল্পনার দুটি রূপ মোহিতলালের জানা ছিল। একটি ক্লাসিক কবির নিরপেক্ষ কল্পনা এবং অন্যটি রোমান্টিক কবির আত্মভাব সাপেক্ষ কল্পনা। রোমান্টিক কবির কল্পনায় থাকে 'আত্মভাবের চশমা' আর ক্লাসিক কবির কল্পনা আত্মনিরপেক্ষ।[৪৮] রোমান্টিক কল্পনার সৃজনবৃত্তি ও সাযুজ্যের কথা আমরা তাঁর মুখে শুনেছি: সাহিত্য ও জীবন প্রবন্ধে কিন্তু নিরপেক্ষ কবি কল্পনাকে তিনি শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন।[৪৯] নিরপেক্ষ কল্পনায় কবির "অহং যেন অনেকটা মজিয়া যায় বলিয়াই রসানুভূতি হয়"[৫০] অন্যপক্ষে আত্মভাবসাপেক্ষ কল্পনায় কবির অহংই যেন অন্তর্মুখী হয়ে আত্মসম্ভোগ করে।[৫১] রোমান্টিক কবিরা - ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরীজ ফ্যান্সিকে যেরকম নিম্নশ্রেণীর কল্পনা বলেছিলেন - মোহিতলালও তেমনি রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি গিয়ে তাকে কাল্পনিক বললেন : তার মধ্যে আছে বাস্তব বিরোধী মনগড়া ব্যাপার। অন্যপক্ষে কল্পনার আছে প্রকৃত সৃজনীশক্তি যার দ্বারা বিশ্বচরাচরের রহস্যভেদ সম্ভব হয়, অঘটন ঘটন পটীয়সী[৫২] সেই কল্পনাই মোহিতলালের মতে প্রকৃত কল্পনা।

> ভিতরের বা বাহিরের যে কোন বস্তু বা তথ্যকে একরূপ ভাবদৃষ্টির সাহায্যে অভিনব আকারে প্রকটিত করার যে কবিবৃত্তি - তাহারই নাম কল্পনা ও ইহাই কবির কাব্য-প্রতিভা।[৫৩]

খেয়ালী কল্পনা বা ফ্যান্সির মতো এই কল্পনা কিন্তু "সত্যের বিপরীত বা মিথ্যা নহে"[৫৪] বরং এই কল্পনার দ্বারা অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান হয়।[৫৫] জীবনের গভীরতর সত্য কবির গভীরতম চেতনায় উদ্ভাসিত হয়। মোহিতলাল এ কল্পনাকে বাস্তব বিচ্যুত বলে মনে করেন না। বিশুদ্ধ রোমান্টিক কল্পনা একটি সৃষ্টিশীল চৈতন্যে অনুক্ষণ উদ্বেজিত। কবি ব্লেক তাকে বলেছিলেন spiritual sensation। বহির্বাস্তব ছিল সেখানে উপেক্ষণীয়। মোহিতলাল কবি-কল্পনার এই রোমান্টিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্ব তাঁর লেখায় প্রায়শই স্বীকার করেছেন। কবিকল্পনার

বাস্তবতার প্রশ্নকে গুরুত্ব দেন নি। লিরিক্যান ব্যালাডের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন কোলরীজ "অবাস্তবকে বাস্তব" করে এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ "বাস্তবকে অবাস্তবের চমৎকারে"[৫৬] মণ্ডিত করে কাব্য লিখেছিলেন। এসব ক্ষেত্রে স্পষ্টতই তাঁর পক্ষপাত রোমান্টিক কল্পনার দিকে। এসব লেখায় তিনি বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা রক্ষা করেননি এসব কল্পনার পক্ষে সাধারণ বাস্তবতার প্রশ্ন অস্বীকার করেছেন, কেবল কবির লেখায় sentiment of reality ফুটে উঠেছে কিনা তারই অন্বেষণ করেছেন। কিন্তু এই সৃজনশীল কল্পনাতত্ত্বের রোমান্টিক অনুভাব তাঁর রচনায় ক্লাসিক কল্পনা ভঙ্গির ভাবনা দ্বারা মণ্ডিত। তাঁর লেখায় তাই প্রথমেই এই কল্পনার বাস্তব অবাস্তবের আলোচনার প্রসঙ্গ ওঠে। যদিও তিনি ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথিত মনের আলোর কথা বলেন তবু তা কেবল কবিরই সৃজিত মাত্র নয়, ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তাঁর মনে হয়নি জাগতিক উৎস রহিত সেই আলোকদ্যুতির কথা, বরং মনে হয়েছে তার জগৎ বৃত্তের অনুচারিতার প্রসঙ্গ। এজন্য মোহিতলাল সৃজনশীল কল্পনাকে বলেন Ideal imitation কবি কল্পনায় বাস্তব অবাস্তবের প্রশ্নকে অবান্তর বলেও কিন্তু তিনি তাকে জগৎমুক্ত করতে পারেননি। জানি কীটসের কথা উদ্ধৃত করে তিনি আবার বলবেন "কল্পনায় যাহাকে সুন্দর বলিয়া চিনিয়া লই তাহা সত্য হইতে বাধ্য"[৫৮] কিন্তু তারই আগের মুহূর্তে বলেন :

> কবি কল্পনা বহির্জগৎ বা বাস্তব সৃষ্টিকে উপেক্ষা করিতে পারে না, বরং বাস্তব অনুভূতির বিশিষ্ট emotion হইলেও - তাহা Ideal Imitation বা কবির মনোমত অনুকৃতি।[৫৯]

সুতরাং কবিকল্পনায় যে সৃজন তাও মোহিতলালের মতে একরকম অনুকৃতি, আদর্শায়িত বটে কিন্তু কাব্যবস্তুরও আছে বাস্তব অস্তিত্ব তাকে তিনি অস্বীকার করেন না। বস্তুত মোহিতলালের কল্পনাতত্ত্বে আছে এই দুয়ের সমাহার, কল্পনার সৃজনশীলতা এবং কল্পনার অনুকৃতির যৌগপত্য। কল্পনা অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করে বটে কিন্তু অনুভবের উচ্চতম স্তরে তাকে অপ্রাকৃত বলে মনে হয় না - এ হল রোমান্টিক সৃজনশীলতার কথা। আবার ভাগবতীসৃষ্টির সামঞ্জস্য পূর্ণ করে যখন কাব্যের জগৎ সৃষ্টির কথা বলেন তিনি তখন বলেন ক্লাসিক কাব্যাদর্শের কথা। তাঁর কাব্য-

চিন্তার প্রথম পর্বে দেখি রোমান্টিকের সৃজনশীল কল্পনার তত্ত্ব, আর শেষ পর্বে দেখি ক্লাসিক কল্পনার প্রতি অত্যাসক্তি। কবি ও কাব্য প্রবন্ধে যে অনুকৃতির কথা তাঁর ক্লাসিক কাব্যাদর্শের ইঙ্গিত দেয়, সাহিত্য ও জীবন প্রবন্ধে নিরপেক্ষ কল্পনার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করলেন। কাব্য ও জীবন প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন এই জীবন ও জগতের সংস্পর্শে কবি হৃদয়ে কাব্য সৃষ্টির বীজ অংকুরিত হয়, এও বলেছিলেন জীবনের সত্য উদ্ভাসিত হয় সত্যকার কবিতায়। যথাদৃষ্ট বাস্তবকে তিনি গ্রহণীয় বলেননি কিন্তু বলেছিলেন :

> জীবন ও জগতের ব্যাপারে যে কবির হৃদয় সাড়া দেয় নাই যিনি এই সৃষ্টির রহস্যকে উপেক্ষা করিয়া জাগ্রত প্রত্যক্ষকে অবহেলা করিয়া আত্মরতির মোহ বিকারের স্বপ্ন প্রলাপ রচনা করেন, তাঁহার ক্যাব্যে সত্যকার অনুভূতি নাই তিনি মিথ্যারই মায়াজাল রচনা করেন।[৬০]

এসব লেখায় জীবন নির্ভরতা স্বীকৃত হয়েছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলেন কবি চিত্ত একরকম 'প্রকৃতির দর্পণ' - সেও ক্লাসিক অনুকৃতির তত্ত্ব, কিন্তু সাহিত্য ও জীবন প্রবন্ধে স্পষ্ট বললেন : জগৎকে আত্মভাব নিরপেক্ষ হয়ে দেখবার কল্পনাই শ্রেষ্ঠ কল্পনা।[৬১] সাহিত্যের স্বধর্ম প্রবন্ধে এই নিরপেক্ষ কল্পনাকেই বললেন শ্রেষ্ঠ কবি শক্তির লক্ষণ। তাঁর কথায় তখন

> কাব্যসৃষ্টি ভগবৎ সৃষ্টির অনুরূপ, তাহা বিশ্বসৃষ্টির রসানুবাদ - মানুষের মনোবৃত্তি অনুযায়ী টীকাভাষ্য নহে।[৬২]

তিনি বললেন :

> কবি কল্পনায় বিশ্ব-সৃষ্টির যে মর্মাণুসন্ধের কথা বলিয়াছি তাহাই সাহিত্যের স্বধর্ম। জগৎ ও জীবনকে সকল মনঃ কল্পিত আদর্শ হইতে মুক্ত করিয়া ... কবি যখন এই বিশ্বসৃষ্টির রসসত্যকে মানুষের মনে নয় - তাহার সমগ্র অনুভূতি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করেন তখনই যে কাব্যের স্বধর্ম পালন হয় ... জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলি ...ইহার প্রমাণ।[৬৩]

সাহিত্য বিতান গ্রন্থের সাহিত্য বিচার প্রবন্ধেও এই ক্লাসিক কল্পনার জয়োচ্চারণ লক্ষ করি :

> কবি-বিধাতার হস্তলিপি রচিত যে কাব্য প্রত্যক্ষ দৃশ্যরূপে সম্মুখে উদ্ঘাটিত রহিয়াছে তাহারই অক্ষরে অক্ষরে দাগা বুলাইয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবকে - ভাবনা করিয়া নয়, মনুষ্য চেতনার অধিগম্য তাহার যে রূপ তাহাই দৃষ্টিগোচর করিয়া বাক্যের পটবস্ত্রে তাহাকে দৃশ্যরূপে স্থাপন করাই উৎকৃষ্ট কবিকীর্তি, তাহাকেই আমি খাঁটি সাহিত্যসৃষ্টি বলিয়াছি।[৬৪]

মোহিতলালের প্রবন্ধে রূপ রচনার গুরুত্বের যে কথা পাই তাও তাঁর ঐই ক্লাসিক মনোধর্মিতা ব্যক্ত করে। সাহিত্য বিচার প্রবন্ধের উপরোক্ত মন্তব্যে তিনি কবির দৃশ্য রচনার ক্ষমতাকেই উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি বললেন। তিনি ঐ প্রবন্ধে কবির মন্ময়তা অপেক্ষা তন্ময় দৃষ্টিকেই অধিকতর মর্যাদা দিয়েছেন। এও তাঁর ক্লাসিক আগ্রহের ফল। সাহিত্য ও জীবন এবং সাহিত্যের স্বরাজ প্রভৃতি প্রবন্ধেও এই Objectivity তাঁর কাছে অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এসব কথা আরো বিশেষ করে অন্যান্য জায়গায় তিনি বলেছেন। তবু এ থেকে দেখা যায় মোহিতলালের সাহিত্যতত্ত্বে কল্পনা নির্ভর রোমান্টিক অতিচারিতা থেকে সরে এসে ক্লাসিক কবির জগদনুকরণের তত্ত্বকে মহিমান্বিত করলেন। ছন্নমতি Fancy বা জগৎ রহস্যের কেন্দ্রবিস্ফারী Imagination আর তাঁর উপজীব্য নয়, সাহিত্যে চাই সেই absolute vision বা নিরপেক্ষ কবিকল্পনা যা ভাগবতী সৃষ্টিরই অনুকারী মাত্র, স্বয়ং স্রষ্টা নয়।

১০.

সত্য মোহিতলালের কাব্যতত্ত্বে মূলতত্ত্ব আর সৌন্দর্য তারই বিচিত্র প্রকাশ। সত্য আর সুন্দরের সম্পর্ক পরস্পর সাপেক্ষ বা অন্যোন্য, সর্বত্রই তার বক্তব্য "যাহা সত্য তাহা অনিবার্যরূপে সুন্দর।"[৬৫] আবার কীটসের কবিতাও উদ্ধার করেছেন তিনি যা দেখে মনে হয় এর বিপরীত ত্রুটিও তাঁর কাছে স্বীকৃত যা সুন্দর তাই সত্য। তবু সত্য সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট করে বিশেষ

কিছু মোহিতলাল বলেননি। আগেই উল্লেখ করেছি ভারতী পর্বের সৌন্দর্যতত্ত্বে সত্য এক পরম আইডিয়া, পরেও এই ধারণার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি কেবল কিছুটা মুডের পার্থক্য হয়েছে। সত্য যে অনুভূত হয় মাত্র তাকে অন্যভাবে পাওয়া যায় না, ভারতী থেকে সরে এসে প্রবাসীর কাব্য কথা - পরের কার কবি ও কাব্য প্রবন্ধে তাইই বললেন :

> এখন প্রশ্ন উঠিবে, সত্য কি ? সত্য আর যাই হোক তাহা বিজ্ঞানের থিয়রি ধর্মশাস্ত্রের অনুশাসন বা দর্শনের মতবাদ নয়। সত্য একটি চিন্তাগতধারণা নয়, তাহা মনুষ্য হৃদয়ের একটি অতি ঘনিষ্ঠ অনুভূতি। সত্যের একটি প্রমাণ এই যে তাহাকে পাইলে কোনোখানে আর কোনও সংশয় থাকে না।[৬৬]

এর সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে তিনি "দিব্যানুভূতি"[৬৭] বলেও মন্তব্য করলেন। দেহচেতনা হৃদয় বেদনা ও মানসক্রিয়া এ তিনের পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্য ঘটলেই এই সত্যের সাক্ষাৎকার সম্ভব হয়।[৬৮] এ সত্যকে লাভ করবার কোন উপায় নেই কেবল সত্যের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়া যায়। সত্য এখানে সক্রিয় কবি বা অণুভোক্তন নিষ্ক্রিয়। সত্য যাকে বরণ করেন তিনিই সত্যের আস্বাদন করে সত্যস্বরূপ হয়ে ওঠেন ; এবং মোহিতলাল বলেন তিনি "কবিকেই বরণ"[৬৯] করেন।

এ সত্য কিন্তু জাগতিক বাস্তব নয় এক অর্থে পরমের অনুভূতি। দৈবানুভূতির মতো তার আস্বাদন কিন্তু সেই পরমের উচ্চতম প্রকাশ সৌন্দর্যে।[৭০] কবি ও কাব্য প্রবন্ধে এই সত্যকে দেখবার ভঙ্গিকে বলতে পারি রোমান্টিক কেননা তা অনুভূতির গুরুত্বকে ততোখানিই স্বীকার করে যার দ্বারা সত্যস্বরূপও হয়ে ওঠা যায়। সে গুরুত্ব অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের মতো নয়। তবু তা রোমান্টিক গোত্রেরই। মোহিতলাল কবি ও কাব্য প্রবন্ধে বলছেন : কবি কল্পনার সত্য সত্য ঠিক বাস্তবের সত্যাসত্যের মতো নয়[৭১] এও বলেছেন :

> কাব্যজগৎ স্বতন্ত্র জগৎ, সেখানে বাস্তবের কঠিন শাসন অগ্রাহ্য করা চলিতে পারে বলিয়াই কবি শক্তিকে পূর্ণমানবতার লীলা বলা যায়। বাস্তবজীবনের সকল অক্ষমতা অজ্ঞান ও অশক্তির হাত এড়াইয়া কবি কাব্যলোকে প্রবেশ করেন।[৭২]

কবি নিজের কল্পনা শক্তির সাহায্যে বাস্তবের সব খণ্ডজীর্ণতার হাত থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তবের সেই গভীর ঐক্য অনুভব করেন। এই ব্যক্তি-মাত্রিক রোমান্টিক সত্যবোধের কথা নিচের মন্তব্যেও স্পষ্ট হয়:

> বিশ্ববিধানের যাহা কিছু বৈচিত্র্য তাহাকে এক দিব্যজ্ঞানের ও আনন্দের ঐক্য সূত্রে বাঁধিয়া — যুক্তি-বিরোধ নীতিবিরোধ ন্যায় বিরোধ — সকলকেই অস্বীকার করিয়া কবি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল রসাতলে তাঁহার আমিটাকে প্রসারিত করিয়া এক অপূর্ব স্ফূর্তি এক মহান উল্লাস প্রকটিত করেন।[৭৩]

একথা আরো স্পষ্ট হল নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে :

> কবি দৃষ্টি যাহা প্রত্যক্ষ করে ঠিক সেইটির অস্তিত্ব যেন তৎ পূর্বে ছিল না - তাহা যেন **airy nothing** কিন্তু তাহাই যখন কবি কল্পনায় নাম ধাম লইয়া শরীরী হইয়া উঠিল, তখন সে আর অবাস্তব বা অসত্য নহে বিশ্ব শিল্পীর সুহস্ত-রচিত কীর্তি বিশেষের মতই তাহা বিশিষ্ট জীবন্ত ও বাস্তব।[৭৪]

এই রোমান্টিক সত্যানুভূতি কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছিল। আগেই কবি কল্পনা প্রসঙ্গে দেখেছি বাস্তব জগৎকে বর্জন করে যে কোন কাব্যবস্তুর গঠন সম্ভব নয় মোহিতলাল সে কথা বলেছেন। **airy nothing** কে গঠন করবার সৃজনীশক্তি রোমান্টিক কবি কল্পনারই আয়ত্ত, বাস্তব জীবনের সব জীর্ণতাকে মায়ামুকুরের মধ্যে প্রতিফলিত করে তাকেই পূর্ণরূপময় করে তোলে সে। কিন্তু মোহিতলাল এরই সঙ্গে জগদনুকৃতির যে ইঙ্গিত এই প্রবন্ধে দিয়েছিলেন তাকেই স্পষ্ট করে বললেন কাব্য ও জীবন প্রবন্ধে। সেখানে ম্যাথু আর্নল্ডের কথা মনে রেখে বললেন :

> সকল উৎকৃষ্ট কাব্য জীবনেরই সত্য ও সুন্দরতম প্রতিরূপ-জীবন দীপিকা।[৭৫]

তখন আর তাঁরপূর্ববর্তী ধারণাগুলি পুরোপুরি কার্যকরী হচ্ছেনা। যে কবি দৃষ্টি জীবন ও জগৎকে দেখায় তার মধ্যে বাস্তব জীবনানুভূতির সন্ধান করছেন তিনি। তখন কেবল কল্পনা বিলাসের দ্বারা কাব্য সৃষ্টির তত্ত্বে আর তাঁর আস্থা নেই, - কালিদাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে

তাতে দেখেছেন বিশুদ্ধ কল্পনা বিলাস - যা তার মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যের লক্ষণ নয়। তখন চাই বাস্তব জীবন স্পর্শ যাকে আর্ণল্ডের অনুসরণে বলছেন **absolute sincerity** । সেও আবার তার সময়কার আধুনিক কাব্যের পঞ্চময় বাস্তব নয়। মোহিতলাল এখানে রোমান্টিকতা ও তদানীন্তন প্রকৃতিবাদিতার মধ্যে একটা মধ্যবিন্দু অবলম্বন করে চলেছেন। সত্য তখনও পরমেরই আদর্শ, ভারতীতে যেমন বলেছিলেন নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েছে এখানেও তাই বললেন :

> কাব্য কল্পনামাত্র নয়, জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে যে সত্যসুন্দরের প্রতিবিম্ব শতখন্ড দর্পণে ভগ্ন ও অসংলগ্নভাবে বিকীর্ণ হইয়া আছে - অতিচঞ্চল ঊর্ম্মি-বন্ধুর নদীবক্ষে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় যাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিতেছে না তাহারই একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি কবি কল্পনায় ধরা পড়ে।[৭৬]

এর মধ্যেও আছে রোমান্টিক সত্যবোধ, কবি কল্পনার সাহায্যে জীবন ও জগতের স্বরূপ আবিষ্কার কিন্তু মোহিতলাল এরই সঙ্গে বলেন :

> মানুষ আপনার কল্পনা বলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক তাহাতে মানুষের স্বতন্ত্র কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক তাহার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে তাহা হইলে এমন একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয়, যাহার জন্য মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে, সে কাব্য সত্যকার বেদনা আশ্বাস ও সান্ত্বনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠেনা।[৭৭]

ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য চাই, বাস্তব জীবন ও জগৎকে ব্যক্ত করা চাই কেবল আত্মরতির মোহবিকারে স্বপ্ন প্রলাপ রচনা[৭৮] করলে কাব্য হয় না। এর সঙ্গে পূর্বোক্ত প্রবন্ধের জগদনুকৃতির তত্ত্বকে এক সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে হবে। পরবর্তী বহু প্রবন্ধে মোহিতলাল এই বাস্তব সত্যকে কাব্যের বস্তুরূপে অন্তত উপেক্ষা করেননি। সাহিত্য ও জীবন প্রবন্ধে তিনি কিন্তু জীবনের বাস্তবানুভূতিকে কেবল কল্পনাজীব্য করেননি। বরং তখন ম্যাথু আর্ণল্ড কথিত **Criticism of life** - হয়েছে তাঁর কাব্য বিচারের সূত্র। তিনি তাঁরই বাক্য উদ্ধৃত করে কাব্যে **"a world**

real in its substance - "[৭৯] খুঁজছেন। এখানে কিন্তু স্পষ্ট করে বলেননি real বলতে তিনি কী বুঝছেন, এই real আমরা জানি ঠিক জাগতিক বাস্তবও নয় - কিন্তু তখন আর স্বানুভূত ব্যক্তি-মাত্রিক সত্যবোধ তাঁর কাছে গ্রাহ্য হচ্ছে না। আগেই বলেছি এখানে আত্মভাব নিরপেক্ষ কল্পনা তাঁর উপজীব্য - কবির অহংবোধের দৃষ্টি দিয়ে আর জগদ্বীক্ষা তাঁর কাম্য নয়। জগৎকে তখন জগতের দিক দিয়ে দেখা চাই। সাহিত্যের স্বরাজ প্রবন্ধে এই ক্লাসিক দৃষ্টি এবং বাস্তববোধ তিনি ব্যক্ত করলেন। অহং পরতন্ত্রের উপর তাঁর বিতৃষ্ণা এবং কল্পনার objectivity প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত হলো। তখনকার দৃষ্টিভঙ্গী মানুষকে সমাজ বিচ্ছিন্ন করে দেখা নয় সমাজলগ্ন করে দেখা। কবি কল্পনার স্বরাজ বলতে বোঝালেন কবি দৃষ্টির আত্মভাব নিরপেক্ষ জগৎ-বীক্ষার কথা। "মানুষকে জগৎ ও জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার এই প্রকৃতি"[৮০]কে তিনি বর্জনীয় মনে করলেন। সাহিত্যে সুনীতি প্রবন্ধে তিনি তথাকথিত সমাজনীতিতে আস্থাশীল না হলেও দুটি কথা স্পষ্ট করে বললেন :

১. আমি কাব্যে কবি-মানসের অতিরিক্ত ব্যক্তি প্রাধান্যে বিশ্বাসী নই [৮১]

২. সাহিত্যিকার যত বড় কবিই হউন, তাঁহার কল্পনা যত ঊর্ধ্বগ ও ব্যাপক হউক, Social conscience বা সামাজিক বিবেকবুদ্ধি হইতে তিনি কখনই একেবারে মুক্ত হইতে পারেন না। [৮২]

এই কথাই আরো গুণান্বিত হয় যখন তিনি বলেন :

১. যে প্রবৃত্তির মূলে আছে আত্মপরায়ণতা বা আত্মসংকোচ-তামসিক আত্মরতি - তাহাই দুর্নীতি। [৮৩]

২. কাব্য জগৎ বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছায়া মাত্র নহে কিন্তু তাই বলিয়া তাহা রসের তুরীয় লোকও নহে ...। [৮৪]

এরকম আরো দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। মোহিতলালের দৃষ্টিভংগির পরিবর্তন এতে অনুভব করা যায়। কাব্যের সত্য বলতে লেখক-চিত্তের অনুভূতিলব্ধ সত্যের যে গুরুত্ব তাঁর প্রথম দিককার লেখায় দেখতে পাই পরের দিকে তা অস্বীকৃত হয়নি কিন্তু শুধ ব্যক্তি-মাত্রিকতাও আর

গ্রাহ্য হয়নি। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সমাজবোধ। মোহিতলালের অবশ্য বিশুদ্ধ রিয়ালিজমে বিশ্বাস নেই। তিনি মনে করেন বস্তুতান্ত্রিকের বুদ্ধি জগৎকে বস্তু সমষ্টিরূপেই দেখে এবং সে দেখায় আছে "কতকগুলা বক্র-ভগ্ন অসম্পূর্ণ অর্থহীন রেখার সমাবেশ"[৮৫]। তিনি এ জিনিস চান না। সাহিত্যে **real**কে **ideal**iseকরবার শক্তিই তাঁর মতে দৈব শক্তি। জগতের বহু বিচিত্রের মধ্যে ভেঙে গেছে যে **ideal** এর রূপ তাকেই গড়ে তুলতে হবে কবিকে আর সে কাজ হবে **Idealised Imitation** এর দৃষ্টি দিয়েই। এদিক থেকেই বলতে পারি মোহিতলালের রোমান্টিক সত্যবোধ ঝোঁকের দিক থেকে ক্লাসিক সত্যাদর্শের অনুচারিতা প্রদর্শন করেছে।

১১.

ভারতী পর্বের লেখালেখিতে মঙ্গলকে গুরুত্ব দেননি মোহিতলাল। তখন বরং এমনও বলেছিলেন যে মঙ্গলের প্রতি অধিক মনোযোগে সুন্দর খন্ডিত হয়। সুন্দরকে পেলে তারই আশ্বাসে সত্য ও মঙ্গলের আশ্বাস পাওয়া যায়। তখন বলেছিলেন কেবল সুন্দর অসুন্দরের বিরোধেই জেগে ওঠে মঙ্গলের প্রতি আসক্তির প্রশ্ন।

কবি ও কাব্য যা প্রবাসীর কাব্যকথারই পরিবর্তিত রূপ - সেখানেও মঙ্গলের প্রশ্ন আলোচিত হয়নি। নীতি বা দার্শনিক তত্ত্বও সেখানে কোন গুরুত্ব পায়নি। সেখানকার আলোচনা কাব্যের সৃজনশীলতা নিয়ে, সৃষ্টির ক্ষেত্রে কল্পনার ভূমিকা নিয়ে কবি ও কাব্যের সম্বন্ধ নিয়ে। অন্য পক্ষে 'সাহিত্য কথা' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে নীতি ও কল্যাণের কিছু আলোচনা করা হয়েছে। ১৩৩৪ থেকে ১৩৪৪ এর মধ্যে লেখা এই প্রবন্ধগুলিতে অবশ্য মোহিতলাল এই কল্যাণকে প্রখরভাবে ব্যক্ত করেননি কিন্তু রোমান্টিক কাব্যাদর্শের দিক থেকে যখন ক্লাসিক আদর্শের দিকে তাঁর ঝোঁকের পরিবর্তন হচ্ছে তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে এর গুরুত্ব কম নয়। সকলেই জানেন ক্লাসিক কাব্যাদর্শে জগৎ বিধানের অনুরক্তি, জগচ্চিত্ররচনার মহিমা স্বীকৃত হয় জাগতিক কল্যাণ বা মঙ্গলবুদ্ধিও সেখানে সাহিত্যের লক্ষ্য। জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির এই পার্থক্য রোমান্টিকের

সঙ্গে ক্লাসিক কাব্যকারের একটি বড়ো পার্থক্য। মোহিতলালের কাব্যচিন্তায় এই ঝোঁকের পরিবর্তনের কথা আগেই বলেছি। এর সঙ্গে আর একটি প্রসঙ্গ যুক্ত করতে চাই। মনে রাখতে হবে এই পর্বে মোহিতলাল বাংলা সাহিত্যে নবীন লেখকদের অনাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যে যে নীতি নিয়মকে ধূলিসাৎ করে একরকম স্বৈরাচার শুরু হয়েছিল তার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁকে সৌন্দর্য তত্ত্বের দিক থেকে সাহিত্যনীতির আদর্শ তৈরি করতে হয়েছে। তাঁর সাহিত্যনীতি রোমান্টিক ও ক্লাসিকের একটা মধ্যবিন্দু অবলম্বন করেছে দেখতে পাই। ফলে তিনি আর ব্যক্তি মাত্রিক সৃজনক্রিয়ায় নির্ভর না করে সাহিত্যের সমাজনির্ভরতার কথা তুলেছেন। আর এরই ফলে একদিকে সমাজ বিচ্ছিন্ন রোমান্টিকতাবাদ অন্যদিকে সমাজসর্বস্ব প্রকৃতিবাদের মাঝখান ধরে নীতি কল্যাণের প্রশ্ন, শ্লীলতা অশ্লীলতার ধারণা তাঁকে বিবেচনা করতে হচ্ছে। আর তাই সমাজ বা রাষ্ট্রনীতিকে প্রেক্ষাপটে রেখে সাহিত্যের অন্তর্বর্তী একটা নৈতিক আদর্শের concept তাঁকে দাঁড় করাতে হচ্ছে।

সাহিত্য কথার সাহিত্যের আদর্শ প্রবন্ধে তিনি বলছেন সাহিত্যের নীতি মুক্তপ্রাণের নীতি সমাজরক্ষণমূলক যুক্তিবিচারের দিক থেকে তা মূল্যহীন। মনুষ্যত্ব-প্রকাশ, প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে আত্মপরিচয়লাভ, ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এসবই সাহিত্যের আদর্শ। এই মতাদর্শ সন্দেহ নেই রোমান্টিক কাব্যাদর্শের অনুগত, এজন্য এখানে সাহিত্যে শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন তিনি বিবেচনা করেননি। কিন্তু এই তাত্ত্বিক প্রত্যাখানের পরেই তিনি আবার একে তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের পটভূমিতে একেবারে অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি দেখলেন তথাকথিত আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশের নামে শুরু হয়েছে জীব-জীবনের পঙ্কোদ্ধার। সাহিত্যের আদর্শ প্রবন্ধে তিনি আধুনিক সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কারণ তিনি মনে করেন তার প্রবৃত্তি "সমাজনীতিবিরুদ্ধ এবং সাহিত্যনীতিরও অনুকূল নয়।"[৮৭] তাতে আছে কেবল "বিজ্ঞান কল্পিত শোণিত মাংস গঠিত দেহযন্ত্রের সমস্যা"[৮৮] যা মোহিতলালের মতে সাহিত্যের বাস্তব নয়। সাহিত্যের সমাজ-মূল্য তিনি স্বীকার করেছিলেন তাকে কিঞ্চিৎ আদর্শায়িত করে, ম্যাথু আর্নল্ডের Criticism of life কথাটিকে সূত্ররূপে ব্যবহার করে। বলেছিলেন

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের কোনও বিরোধ নেই। অতঃপর সাহিত্যের নীতি দুর্নীতির প্রসঙ্গ এবং সমাজকল্যাণের পরোক্ষ চিন্তা উঠে এল 'সাহিত্যে সুনীতি' প্রবন্ধে। সেখানকার তাত্ত্বিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে বললেন :

> সাহিত্যের অতি উন্নত আদর্শ - রসতত্ত্বের অতিসূক্ষ্ম অনুধাবনা - কোনও যুগ বা সাহিত্য বিশেষের পক্ষেই সত্য নয়, তাহা চিরন্তন ও সার্বভৌমিক - তথাপি যুগ-বিশেষের সাহিত্য হইতে এই তত্ত্বের প্রমাণ প্রয়োগ তেমন সুসাধ্য হয় না বলিয়া সেই বিশেষ সাহিত্যের জন্য রসতত্ত্বের নূতনতর ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় ...।[৮৯]

এ থেকে দেখা যায় রসতত্ত্বের একটা যুগমাত্রিক আদর্শও তিনি স্বীকার করেন। এজন্য তিনি রসতত্ত্বের সেই চিরন্তন আদর্শকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের জন্য তুলে রেখে বললেন :

> রাস্তায় ঘাটে তথাকথিত সাহিত্যের যে রস বিপণি আজ ম্লেচ্ছগণের পিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে সেখানে আমি সে দেবতার (রসের ঠাকুরের)[৯০] নামও স্মরণ করিব না; অতিশয় বেরসিক নীতিবাগীশের দলে ভিড়িয়া সুনীতিরই জয়গান করিব।[৯১]

স্মরণ করি শুষ্ক কাব্যে সমাজ রক্ষা হয় না বলে মোহিতলাল গদ্যাস্ত্র যা হাতে তুলে নিয়েছিলেন -সে অস্ত্র তাঁর সমালোচনা, মোহিতলালের বক্তব্য এখানে রসতত্ত্বের এলাকা ছেড়ে সমাজনীতির এলাকায় ঢুকে পড়েছে। আগেই উল্লেখ করেছি তিনি সাহিত্যিকারকে সামাজিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেননি।[৯২] এখন বরং অতিরিক্ত ব্যক্তি প্রাধান্য থেকে সরে গিয়ে "সমষ্টি জীবনের কল্যাণ আদর্শ"[৯৩] গ্রহণীয় মনে করেছেন, তার জন্য - সমষ্টির জন্য ব্যক্তির আত্মবলিদানের মধ্যে সত্যসুন্দরের আদর্শের অনুগামিতা[৯৪] লক্ষ করেছেন। মোহিতলাল এসব লেখায় তাঁর পূর্ববর্তী নান্দনিক অবস্থান থেকে সরে এসেছেন এবং সামাজিক বিবেক বুদ্ধির দ্বারা সাহিত্য-কারের সৃষ্টির বিচার করবার প্রস্তাব করলেন।আমাদের স্মরণ হয় একদা তিনি যখন যুক্তি-বিরোধ নীতি-বিরোধ ও ন্যায়-বিরোধ[৯৫] অস্বীকার করে কাব্যে সর্বসংস্কার মুক্তির আদর্শ প্রচার করেছিলেন তখন তার মনে হয়েছিল "প্রয়োজন নীতি এই সত্যসুন্দরের বিরুদ্ধে কলরব করছে"[৯৬]। সন্দেহ নেই তাঁর এখনকার সাহিত্য বিচারেরও আছে তাত্ত্বিক প্রবর্তনা - "যে

প্রবৃত্তির মূলে আছে আত্মপরায়ণতা বা আত্মসংকোচ-তামসিক আত্মরতি-তাহাই দুর্নীতি"[১৭] তবু তাঁর সোচ্চার ঘোষণা কাব্যতত্ত্ব ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে - সেখানে তিনি স্পষ্টই বলছেন

> তাই রসতত্ত্ব আপাততঃ শিকায় তুলিয়া রাখিয়া আমরা সাহিত্যে-অন্যনীতির ত কথাই নাই সামাজিক সুনীতিকেও প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই।[১৮]

এজন্য যে চিত্রাঙ্গদাকে একদা কাব্যের দৃষ্টান্ত বলে তিনি গ্রহণ করেছিলেন[১১] সেখানে সৃষ্টির সত্য উপেক্ষার দুর্নীতি দেখতে পেলেন,[১০০] A Doll's House এ দেখলেন "বৃহত্তর ও মহত্তর নীতির বিরুদ্ধে আক্রোশ।"[১০১]

এ সব দেখে মনে হয় নীতি ও কল্যাণের প্রশ্নে মোহিতলালের পূর্ববর্তী মানসিক অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। সমাজনীতিকেও তিনি সাহিত্য বিচারের অঙ্গীভূত করেছেন। নিজেরই পূর্ববর্তী বক্তব্যকে খন্ডন করে সাহিত্য বিচার প্রবন্ধে লিখেছেন : "জীবনের আলেখ্য রচনায় সর্ব সংস্কার মুক্ত একটা মানবাত্মার কল্পনাই মিথ্যা",[১০২] যেহেতু সমাজ নীতি ও ধর্মনীতি মানুষের চেতনায় বদ্ধমূল, সুতরাং সে সংস্কারকে অস্বীকার করলে সৃষ্টির মূলনীতি থেকেই বিচ্যুত হতে হয়। মোহিতলালের এই অবস্থান নিঃসন্দেহে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তনের দিক নির্দেশ করে।

১২.

সাহিত্যের কাজ রূপ সৃষ্টি, এ কথা মোহিতলাল তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম থেকেই বলে এসেছেন। ভারতীর সৌন্দর্যতত্ত্ব আলোচনায় সেকথা বলবার স্পষ্ট অবকাশ ছিল না, কিন্তু পরমের বহু বিচিত্র প্রকাশের সামঞ্জস্য ও সমগ্রতার মধ্যেই যে সৌন্দর্যের উন্মেষ সে কথা বলেছিলেন। আর অগ্রহায়ণের ভারতীতে বাংলা কবিতার সমালোচনা করতে গিয়ে ভাষার উপরে যে পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তাতে এই রূপ নির্মিতির তত্ত্বই সূচিত হয়। তিনি দুটি কথা বলেছিলেন :

১. ভাষাই হচ্ছে কবিত্বের প্রথম পরিচয়

আর

২. প্রত্যেক কবির ভাষা স্বতন্ত্র, বর্ণমালার অক্ষরগুলাই নিজের নয় - এমন কথা বললে ভুল হয় না।[১০৩]

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্য' অবশ্য তার অনেক আগে প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে বলা হয়েছিল প্রকাশই কবিত্ব। কিন্তু মোহিতলালের উদ্ধৃত মন্তব্য দুটি যদিও প্রকাশের কথা বোঝাতে চায় তবু প্রকাশ মাত্রকেই বোঝায় না বোঝায় ভাষার সাহায্যে রূপময় করে তোলার ক্ষমতাকে। কবি ও কাব্য প্রবন্ধে তিনি বললেন :

> কাব্য সৃষ্টিতে কবির সমগ্র সাধনা ও চেষ্টা মুখ্যতঃ রসকে লইয়া ব্যাপৃত নয় একটি অতি অপূর্ব ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে কেমন করিয়া যথাযথ আকারে মূর্তিমন্ত করিয়া তুলিবেন - ইহাই কবির একমাত্র ভাবনা - ইহাতেই তাঁহার আনন্দ।[১০৪]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে আমরা দেখেছি রূপ ও অরূপের দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ "রূপের দ্বারা অরূপকে প্রকাশ করা অরূপের দ্বারা রূপকে আচ্ছন্ন করে দেখা",[১০৫] মোহিতলালের সাহিত্য চিন্তায় কিন্তু রূপের অদ্বৈত মহিমা। কবি ও কাব্য প্রবন্ধে বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনার মধ্যেও বাণী সৃষ্টির গুরুত্ব প্রকটন করেছেন।[১০৬] সাহিত্যে এই রূপের মহিমা প্রকাশ তিনি নানা প্রবন্ধেই করেছেন। সাহিত্য কথা গ্রন্থে বিশেষ করে 'সাহিত্যের ছোট ও বড়' এবং 'রস ও রূপ" নামে দুটি প্রবন্ধে এই রূপের কথাই বলা হয়েছে। সাহিত্য বিচারে যে বিশেষ করে ফর্মই বিবেচ্য তার কথা বলতে গিয়ে লিখলেন :

> matter বা বিষয়বস্তু কবির নিজেরই উদ্ভাবিত হউক বা অপরের নিকট ধার করিয়াই হউক, কবিত্ব বিচারে তাহা অবান্তর -- কারণ সেখানে what নয় how-টাই বড় প্রশ্ন - একমাত্র বিবেচনার বিষয়।[১০৭]

এই ফর্ম অবশ্য শেষ পর্যন্ত রস ... হয়, রূপ ও রসের একটা অন্যোন্য সম্বন্ধ কাব্যে দেখা যায়। রস ও রূপ প্রবন্ধে এই ফর্মকে "কাব্যের সর্বস্ব"[১০৮] বলা হল এবং কায়াকান্তির

তত্ত্ব পেলাম আমরা। কাব্যের রূপই বিবেচ্য কিন্তু তা রসগর্ভ হয়ে ওঠা চাই। তিনি বললেন :

> বিষয় সাপেক্ষ অথচ বিষয়াতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র সামগ্রী-কায়া নহে কায়ার কান্তি মুখ নহে মুখের লাবণ্য - ইহাই কাব্যের রসরূপ।[১০৯]

এই কায়াকান্তি বাদ তাঁর 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধে বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সেখানে বললেন "ভাষার সাহায্যে রূপ সৃষ্টি"[১১০] করাই সাহিত্যের কাজ। সাহিত্য সৃষ্টিতে "জীবন ও জগৎ ঘটিত একটা সাক্ষাৎ উপলব্ধি" তাঁর মতে "ভাবে নয় রূপ সমন্বিত হইয়া বিদ্যমান থাকা চাই"।[১১১] কায়া কান্তি বাদ সম্বন্ধে বললেন :

> কায়া হইতে কান্তি যেমন পৃথক করা যায় না সাহিত্যেও তেমনই জীবন হইতে জীবনের রূপকে পৃথক করা যায় না।[১১২]

সাহিত্য বিচারে এই সিদ্ধান্তকে তিনি কায়াকান্তি বাদ নামে অভিহিত করেছেন।[১১৩] আর জীবনের রূপ বলতে 'জীবনের সর্বাঙ্গীন সুষমার অভিব্যক্তি'[১১৪]কে বোঝাচ্ছেন।

মোহিতলাল রূপ রচনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন যথেষ্ট কিন্তু রসকে একেবারে অস্বীকার করতে পারেননি। 'কবি ও কাব্য' প্রবন্ধে কবিচিত্তের রসোল্লাসের কথা স্বীকার করেছিলেন। 'রস ও রূপ' প্রবন্ধে এই রসতত্ত্বের কথা ঘুরে ফিরে এসেছে। বার বার এসেছে expressionএর কথা। বাণীরূপ রচনাই কাব্যবিচারের বড় কথা, তাতেই কাব্যের রূপসৃষ্টি হয় কিন্তু সে কাব্যের আত্মা রস। মোহিতলালের আলোচনায় একটা সময় expression আর রূপ সমার্থক।[১১৫] এবং "এই expressionই কবিতার সর্বস্ব"[১১৬]। মোহিতলাল অবশ্য রূপ ও রসের যে যৌগপত্য রচনা করেন তার নাম দেন রসরূপ। এই রূপ সৃষ্টির তত্ত্ব মোহিতলালের কাব্যসৃষ্টির একটি বিশিষ্টতত্ত্ব। এর মধ্যেও আছে তাঁর মানসিক প্রবণতার প্রকাশ।

১৩.

সাহিত্য তত্ত্ব : বঙ্কিম চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল

বঙ্কিম ও মোহিতলাল

বঙ্কিম চন্দ্র রবীন্দ্রনাথ এবং মোহিতলাল বাংলার তিন সাহিত্যকারের মধ্যে তিন পুরুষের ব্যবধান। তিনজনেই সাহিত্যচর্চার সূত্রে সাহিত্য ও সমালোচনার আদর্শ রচনা করে গেছেন। বঙ্কিম চন্দ্রের কালে সাহিত্যে কতকটা শিথিল ভাবে ক্লাসিক প্রবণতা কাজ করছিল। রবীন্দ্রনাথের পর্ব রোমান্টিক-ক্লাসিজমের পর্ব। বঙ্কিমের সাহিত্য চেতনায় আছে বহিরঙ্গ ক্লাসিক রূপাকৃতির ভিতরে রোমান্টিকতার অন্তর্প্রবাহ। মোহিতলাল রোমান্টিকতা দিয়ে শুরু করে একটা ক্লাসিক কাব্যাদর্শে পৌঁছতে চাইছিলেন।

বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্যাদর্শে যুগপৎ ক্লাসিক ও রোমান্টিক চিন্তার পরিচয় আছে। তাঁর লেখায় ক্লাসিক অনুকৃতি ও রোমান্টিক সৃষ্টিবাদের কথা একই সঙ্গে দেখতে পাই। স্বভাবানুকারিতাও স্বভাবাতিরিক্ততার কথা একই বাক্যে তিনি বলে নেন। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সৃজন ক্ষমতার তিনটি স্তর বিন্যাস করেছেন। যথাচিত্র রচনা, আদর্শায়িত বাস্তব এবং কাল্পনিক সৃষ্টি ক্ষমতা। তৃতীয় ক্ষমতাই তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ। এই ক্ষমতার বলে জীবনহীন আদর্শকেও জীবন্ত করে তোলা সম্ভব। মোহিতলালের সঙ্গে বঙ্কিমের এখানে মিল হতে পারে। মোহিতলাল যথাচিত্র রচনাকে আদৌ কবিত্ব বলে মনে করেন না। আগেই আলোচনা করেছি তাঁর প্রথম দিককার লেখায় সৃষ্টিবাদই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনুকৃতিবাদের প্রতি তাঁর আগ্রহ। তিনি কিছু স্বাতন্ত্র্য দিয়ে কবিচিত্তকে প্রকৃতির দর্পণ[১১৭] বলতেও পারেন, এবং আগেই বলেছি কবির কাজকে Ideal Imitation বা মনোগত অনুকৃতি[১১৮]ও তিনি বলেন। বঙ্কিম ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে প্রকৃত বস্তুকেও কাব্যের সামগ্রী করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন,[১১৯] মোহিতলাল সাহিত্যে সৃজিত বাস্তবতার পক্ষপাতী। আমরা এই বিষয়ে তাঁর দুরকম কথা শুনেছি, তিনি সাহিত্যের সত্যাসত্যকে জাগতিক সত্যের চেয়ে কিছু পৃথক বলে মনে করেন, কাব্যে বাস্তবের শাসন উপেক্ষা করা চলে বলে আমাদের জানান[১২০]

আবার কবিকল্পনা বহির্জগৎ বা বাস্তব সৃষ্টিকে উপেক্ষা করতে পারে না[১২১] বলেও বলেন। শেষ পর্যন্ত মোহিতলালের বক্তব্য **Idealised imitation**তত্ত্বের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে তাতে অবশ্য রোমান্টিক সৃষ্টি বাদের কিছু ভাব একেবারে অস্পৃশ্য থাকে না।

সাহিত্য সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, সে কথা বঙ্কিম মোহিতলাল দুজনেই বলেন। সৌন্দর্য সৃষ্টির এই ধারণায় বঙ্কিম কিন্তু থেমে যান নি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত লোকহিত - এরকম তাঁর কথায় মনে হয়। সৌন্দর্য সৃষ্টি সাহিত্যের সর্ব প্রধান গুণ কিন্তু সে সৌন্দর্যের উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন। কবিরা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ রচনা করে জগতের চিত্ত-শুদ্ধি সাধন করবেন এই তাঁর অভিপ্রায়। নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদনে বঙ্কিম সৌন্দর্যসৃষ্টি ও ধর্মসম্মত হিতকারিতার কথা সাহিত্যের উদ্দেশ্য হিসেবে বলেছেন। আর চিত্তশুদ্ধি থেকে তিনি ধর্মে চলে গেছেন। সাহিত্য তাঁর কাছে ধর্মেরই অংশ। তখন তিনি সাহিত্যকে সোপান করে ধর্মের মঞ্চে আরোহণ করতে বলেছেন।[১২২] মোহিতলাল ধর্মকে সাহিত্যের উপরে স্থান-দিতে রাজী ছিলেন না, সাহিত্যই ছিল তাঁর ধর্ম। কিন্তু সাহিত্যে সৌন্দর্য ও কল্যাণকেও মোহিতলাল গুরুত্ব দেন। প্রথম দিকে ততোটা দেননি, শেষ দিকে কল্যাণকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। যে অর্থে সামাজিক লোকহিতের কথা হয় মোহিতলাল ততোখানি বলেননি, কিন্তু লোককল্যাণ যে তাঁর সাহিত্যতত্ত্বের অঙ্গীভূত তা বুঝিয়ে দেন। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি সামাজিক ও সাহিত্যিক সুনীতি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত যুদ্ধও করে গেছেন। বঙ্কিম সাহিত্যের উদ্দেশ্য করেছিলেন ধর্ম, ধর্মের মূল তাঁর মতে চিত্তশুদ্ধি। মোহিতলালের কাছে সৌন্দর্যবোধের জন্য চিত্তশুদ্ধি প্রয়োজন। সৌন্দর্য তাঁর কাছে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সকল বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য পূর্ণ সেই সুন্দরকে দেখবার জন্য চাই চিত্তশুদ্ধি। কিন্তু এর বেশি তিনি কখনো এগোন নি। বরং চিত্তশুদ্ধির কথা পরে আর তোলেনওনি। ধর্ম ও সাহিত্য প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বের পূর্ববর্তী অবস্থানের পরিবর্তন করেছিলেন। সৃষ্টি,—কল্পনামূলক-সৃষ্টি তখন আর তাঁর কাছে একমাত্র গণনীয় নয়, তিনি তখন মনে করছেন কবির সৃষ্টি ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলেই তা সুন্দর।

> ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুত কবির সৃষ্টি সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না। ধর্মের মোহিনী মূর্ত্তির কাছে সাহিত্যের প্রভাব বড় খাটো হইয়া যায়।[১২৩]

এখানে বংকিম সাহিত্যকে অনুকরণ বলে মনে করেন। দীনবন্ধুর এরকম ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল বলে তিনি আগেই আমাদের বলেছিলেন। তার প্রতিভাবানের অনুকরণকে বংকিম দূষ্য[১২৪] বলে মনেও করেননা। আবার রোমান্টিক সৃষ্টিবাদকে সরিয়ে রেখে মোহিতলালও অনুরূপ উক্তি করেন কাব্যও জীবন প্রবন্ধে। তিনি বলেন

> মানুষ আপনার কল্পনাবলে যে জগৎ সৃষ্টি করে তাহা যতই মনোহর হউক তাহাতে মানুষের কল্পনার মাহাত্ম্য যতই প্রমাণিত হউক তাহার সঙ্গে ভাগবতী সৃষ্টির গভীরতর সামঞ্জস্য যদি না থাকে তাহা হইলে এমন একটা সঙ্গতি বা সত্যের হানি হয় যাহার জন্য মানুষের অন্তরতম চেতনা আশ্রয়হীন হইয়া পড়ে, - - - -"[১২৫]

মোহিতলাল বংকিমের মতো স্পষ্ট না বলতে পারলেও বংকিমের কথা এবং মোহিতলালের বক্তব্য ঘনিষ্ট। মোহিতলালকে রোমান্টিক সাহিত্যের সৃষ্টিবাদের সঙ্গে অনুকৃতিবাদকে মেশাতে হয়েছে। এখানে সেই মিশ্রণের ফলই এই ভাগবতী সৃষ্টির সামঞ্জস্যের ধারণায় ব্যক্ত হয়েছে।

বংকিমের কাছে সাহিত্য সত্যমূলক এবং যা সত্য তাই ধর্ম। সাহিত্য হল ধর্মের সোপান। বংকিমের সমীকরণ নিম্নরূপ :

সত্য = ধর্ম

|

সাহিত্য

এই সাহিত্যের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি[১২৬] চিত্তশুদ্ধি ধর্মের মূল[১২৭] এবং তা সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন ও সামঞ্জস্যের ফল।[১২৮] মোহিতলালের সমীকরণ একটু ভিন্ন কিন্তু স্বরূপত সামঞ্জস্যপূর্ণ। মোহিতলাল বলেন সত্যের পূর্ণ প্রকাশই সুন্দর। সুন্দরই সাহিত্য ও ধর্মের মূল :

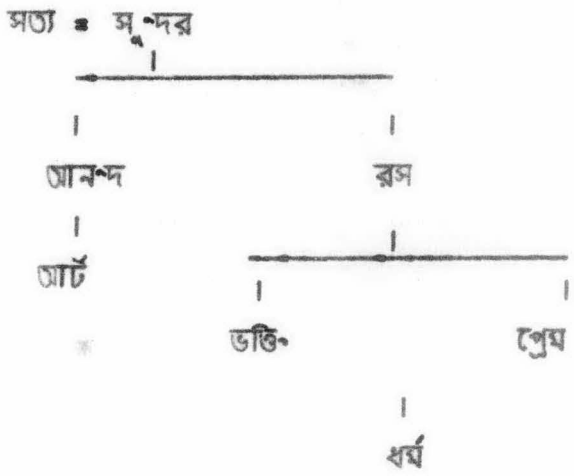

মোহিতলালের সৃষ্টিতত্ত্বে সুন্দরই সৃষ্টিমূল তিনিই আবার সত্যের সঙ্গে অভিন্ন। তাঁরই রসরূপ থেকে ধর্মের উদ্ভব। বংকিম যে সামঞ্জস্যকে বলেন চিত্তশুদ্ধি, মোহিতলালেও তা তাই, সকল বিরোধের সমন্বয়েই চিত্তশুদ্ধি।[১২১] এই চিত্তশুদ্ধির ফলে বংকিমের ধর্মলাভ আর মোহিতলালের লাভ সুন্দরবোধ। আর তত্ত্ব গত দিক থেকে দেখলে মনে হয় মোহিতলালের এই সুন্দর আর বংকিমের এই ধর্ম দুয়েরই মূল সেই এক বা পরম কেননা উভয়েরই চিন্তায় একমাত্র তিনিই সত্য স্বরূপ।

১৪.

রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা মূলক লেখাগুলি, 'আলোচনা' এবং 'সাহিত্য' লেখা হবার পরে মোহিতলাল সাহিত্যতত্ত্বের চর্চা শুরু করেছেন। 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি লেখা হচ্ছে তখন। বিচিত্রায় বিবাদ সভায় তিনিও ছিলেন। মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে শুরু করেছিলেন শেষ করেছেন বংকিমে। একে সাহিত্যের অগ্রসরতা বা পশ্চাদপসরণ এমন কিছু বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিতলালের বড় মিল তাঁদের সৃজনশীল কল্পনার গুরুত্বে। রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলালের উভয়েরই এই সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস ছিলো। কবির কাজ যে সৌন্দর্য সৃষ্টি সে কথা রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে মোহিতলালও বলেন। সে সৃষ্টি সৃজনশীল কল্পনার মহিমায় মহিমান্বিত।

মোহিতলাল ভারতীতে শুরু করেছিলেন এই বলে যে সত্যের ঐক্যরূপ সৃষ্টির মধ্যে নানা বৈচিত্র্যে ভেঙে পড়েছে। আর এই কথাই কাব্য ও জীবন প্রবন্ধে বললেন। জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে সত্য সুন্দরের যে প্রতিবিম্ব শতখণ্ডে ভেঙে পড়েছে তাকে পূর্ণায়ত করাই ক কবির কাজ :

> কাব্য কল্পনা মাত্র নয়, জগতের বিপুল বিস্তারের মধ্যে যে সত্য সুন্দরের প্রতিবিম্ব শতখণ্ড দর্পণে ভগ্ন ও অসংলগ্নভাবে বিকীর্ণ হইয়া আছে - অতি চঞ্চল ঊর্মি-বন্ধুর নদীবক্ষে চন্দ্রবিম্বের ন্যায় যাহা পূর্ণাবয়ব হইতে পারিতেছ না- তাহারই একটি পূর্ণ প্রতিচ্ছবি কবি-কল্পনায় ধরা পড়ে।[১৩০]

এ অবস্থান ভারতী থেকে দূরবর্তী নয়। মোহিতলাল ভারতীর মাঘ ১৩২৬ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে সেই জাগতিক মিথ্যার মোটা পর্দার অভ্যন্তরে সত্যের পূর্ণ জ্যোতি বিকিরিত হতে দেখে ছিলেন। কবি ও কাব্য প্রবন্ধে বারবার এই সৃষ্টি মহিমার কথা, কল্পনার সাহায্যে সৃষ্টি রহস্যের অন্তর্ভেদ করবার কথা আছে। কবির সৃষ্টি-কল্পনা বাস্তবের কঠিন শাসনকে অগ্রাহ্য[১৩১] করে সাহিত্যে বাস্তব-মুক্তি[১৩২] ঘটাতে পারে। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতত্ত্বে অনুরূপ মন্তব্য আমরা প্রায়ই দেখতে পাই। সাহিত্যের পথে গ্রন্থের কবির কৈফিয়ৎ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন "সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে"। আলোচনা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন জগৎকে ঠিকমতো পাইনা বলে তা আমাদের কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। যখন তা সত্যমূর্তিতে ধরা দেবে তখন জগৎ আমাদের কাছে আর মিথ্যা থাকবে না। আর সাহিত্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে তাই হয় কেননা সৌন্দর্য হৃদয়ের অসাড়তা দূর করে জগতের উপর তার অধিকার বিস্তৃত করে দেয়। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এই হৃদয়ের অসাড়তা দূর করবার কথা ভোলেননি, সৌন্দর্যের ধারণাকে বিপরীত দিক থেকে দেখিয়েছেন - যাতে মানুষের আত্মোপলব্ধি তাই সুন্দর। সাহিত্যের সত্যতা মানুষের উপলব্ধিতে, এরকম কথা মোহিতলাল অবশ্য স্বীকার করতে রাজী হননি শেষ পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথের এই ধারণাকে অহং পরতন্ত্র বলে মোহিতলাল বর্জন করেন। সাহিত্যে বস্তুর মনঃকল্পিত রূপ রচনার বক্তব্যকে মোহিতলাল গ্রহণ করেননি, রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কল্পিত বাস্তব পরিত্যাগ করে তিনি শেষ পর্যন্ত বাস্তবের মূল অন্বেষণের পক্ষপাতী। সৌন্দর্যের রোমান্টিক ঐক্যতত্ত্বে দুজনেরই

বিশ্বাস ছিলো, দুজনেরই লেখায় সৌন্দর্যের সামঞ্জস্যবোধের কথা আছে। মোহিতলাল সাহিত্যের প্রকাশকে চরম বলে মনে করতেন। রূপসৃষ্টির গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথের লেখায়ও স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন রস সাহিত্যে বিষয়টা উপাদান তার রূপটাই চরম।[১৩৩] প্রকাশই যে কবিত্ব, রূপের দ্বারা অরূপকে প্রকাশই[১৩৪] সাহিত্যসৃষ্টি, একথা রবীন্দ্রনাথ অনেক লিখাতেই বলেছেন। মোহিতলালও বলেন সাহিত্যে রূপই মুখ্য বস্তুটা অবলম্বন মাত্র। মোহিতলালের এ ধারণার পিছনে সোপেনহাওয়ারের প্রভাব আছে। তিনি বলেন :

> রচনার উৎকর্ষের উপরেই গ্রন্থের উৎকর্ষ নির্ভর করে, এই রচনার গুণেই সাহিত্যের রসরূপ প্রকাশ পায়। খাঁটি সাহিত্যিক রচনার এই রসরূপই মুখ্য - "[১৩৬]

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিতলালের পার্থক্য এই যে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত উপলব্ধির তত্ত্বে বস্তুর কাল্পনিক তাৎপর্য সন্ধানী, মোহিতলাল বস্তুর বাস্তবমূল সন্ধান করেন। মোহিতলালের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বড়ো তফাৎ সৃষ্টিশীলতার ধারণায়। রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক সৃষ্টিবাদ কোনদিন পরিত্যাগ করেননি। তাঁর রোমান্টিক চিন্তার বড়ো পরিচয় মানুষ সম্বন্ধে তাঁর বোধে। রোমান্টিকেরা মানুষের অনন্ত সম্ভাবনায় "Infinite reservoir of possibilities"[১৩৭] এ বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথ ও মানুষকেই শেষ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তার ভূমিকায় বসিয়েছেন। বস্তুর সংকীর্ণ ক্ষেত্র থেকে সত্যের অসীমতায় স্থাপন করে তিনি মানুষকে দেখেন। অন্যপক্ষে মোহিতলাল মানুষকে এই অসীমের মধ্যে স্থাপন করে দেখতে চান না। তাঁর কালের মানুষের সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মানুষের সীমাবদ্ধ মূর্তিকেই আমাদের দৃষ্টিতে প্রকটিত করে। রবীন্দ্রনাথ এজন্য পৃথকভাবে কল্যাণের প্রশ্ন বিবেচ্য বলে মনে করেন না। মোহিতলাল যেহেতু সমাজের মধ্যে মানুষের সীমাবদ্ধ প্রকৃতিকে দেখেন তাই সমাজ তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ক্লাসিক কবিদের অনুগত। মানুষ স্বভাবতই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী সামাজিক শৃঙ্খলার বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়েই তার সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করা সম্ভব। মোহিতলাল এজন্য শেষ পর্যন্ত রক্ষণশীলতার পক্ষানুসারী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যও সাহিত্যাদর্শ সম্মুখে রেখে আর পুরোপুরি রক্ষণশীলতার অবস্থানে ফিরে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

মোহিতলালের সাহিত্যাদর্শে তাই সৃষ্টিশীল কল্পনার গুরুত্ব যেমন স্বীকৃত হলো তেমনি তার Ideal-imitation-এর তত্ত্বও স্বীকৃত হলো। তাঁর লেখায় সাহিত্যের বস্তু অতিরিক্ত সত্য ব্যক্ত করবার জোর যতখানি, তাকে বস্তুর উপর নির্ভরশীল করবার ইচ্ছেও তার চেয়ে কম নয়। এজন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শের উপর নির্ভর কিংবা সাহিত্যতত্ত্বের রোমান্টিক আদর্শের উপর নির্ভর করে শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে সরে যেতে হয়ে ছিল বঙ্কিমে। মোহিতলাল বঙ্কিমের উপন্যাস গুলির মধ্যে রোমান্টিকতার ফল্গুধারা দেখেছেন আর উপরে দেখেছেন ক্লাসিক সংযম। তাঁর নিজের লেখার ধর্মও তাই।

> "স্বপন পসারী হইতে স্মরগরল পর্যন্ত ঐ Romantic ও Classical দুই ধারার যুগ্ম স্রোত লক্ষ করা যাইবে। স্বপন পসারীতে Romantic- এর প্রাধান্য স্মরগরলে classical-এর পূর্ণপ্রতিষ্ঠা।"[১৩৮]

মোহিতলাল রোমান্টিক কাব্য রচনার মতো রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব নিয়ে শুরু করেছিলেন, শেষ করেছেন নিও-ক্লাসিক কাব্যাদর্শে, এজন্য রবীন্দ্রনাথে নয় বঙ্কিমেই তাঁর শেষ নির্ভরশীলতা। স্মরণ করতে পারি মোহিতলালের এই নিও-ক্লাসিক কাব্যাদর্শে আস্থা ব্যক্ত হচ্ছে যখন তখন ইংরেজি সাহিত্যেও একটি ক্লাসিক রিভাইভ্যালের প্রবণতা কাজ করছে। এই প্রবণতা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই দেখা দিয়েছিল। মোহিতলাল হয়তো সচেতন ভাবে তা লক্ষও করে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল দুজনেই সাহিত্যে রূপ সৃষ্টির গুরুত্ব স্বীকার করেন। রবীন্দ্রনাথের বহু মন্তব্যে এই রূপ রচনার কথা স্বীকার করা হয়েছে। দুজনের ধারণা বহুদূর পর্যন্ত এক। কিন্তু কিছু পার্থক্যও আছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ ব্যক্তির সানুভূত সত্যের প্রকাশ আর মোহিত লালের প্রকাশ বস্তুর রসরূপে প্রকাশ। ক্রোচের শিল্পতত্ত্বে form-এর গুরুত্ব যথেষ্ট এবং শেষ পর্যন্ত তা বিষয়াতিরিক্ত নয় বরং বিষয়ে প্রতীতি নির্ভর। রূপের সম্পূর্ণতা তাঁর কাছে বিষয়েরই পূর্ণ অভিব্যক্তি। রূপবাদীদের কাছে বিষয়ের গুরুত্ব তুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ কোন অর্থেই

বিশুদ্ধ রূপবাদী নন কিন্তু তাঁর তত্ত্বে রূপসৃষ্টির গুরুত্ব বেশি বিষয়ের মর্যাদা কম। বিষয়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি কোথাও একটু বিষয়ানুরক্তি আছে। তবে ঝোঁক রূপবাদীদের দিকে তথ্যকে তিনি ততটুকু স্বীকার করেন যতটুকুর দ্বারা তাকে উপলক্ষ করে সত্যকে প্রকাশ করা যায়। তাঁর কাছে "সাহিত্য যে আনন্দ দেয় সেটা সৌন্দর্যের আনন্দ"[১৩৯] আর "আনন্দকে প্রকাশ করে সুন্দর" এবং "সুন্দরকে পরিস্ফুট করে শিল্প"[১৪০]। তিনি আরো "রচনার

মোহিতলালের প্রকাশতত্ত্ব সোপেন হাওয়ার এর অনুসারী, তিনি বলেন "রচনার উৎকর্ষের উপরেই গ্রন্থের উৎকর্ষ নির্ভর করে"[১৪১] রচনার রূপ বা ভঙ্গিটাই আসল"। সাহিত্য বিষয়কে অবলম্বন করেই এই বিষয়ের অতিরিক্ত রূপ সৌন্দর্য রচনা করে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মোহিতলালের পার্থক্য এইখানে যে মোহিতলাল রচনার উৎকর্ষের উপর নির্ভর করেন যা সোপেন হাওয়ারের অনুসরণে তাঁর লেখাতে স্টাইল নামে অভিব্যক্ত হয় এই স্টাইলই তাঁর রূপ নির্মিতি বিষয়ক সব তত্ত্বের সারতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বস্তুমাত্রই তথ্য এবং তা খণ্ডিত। অনুভূতিশীল চিত্তের আলোকসম্পাতে তার সামগ্রিক রূপরচনা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তা সত্য নয়। তাঁর কাছে বস্তুর সত্যরূপ উদ্ঘাটিত হয় রসের ভূমিকায়। রসসৃষ্টির মধ্যে বাস্তবের সত্য মূর্তি দেখতে পান তিনি। কোন সত্যের এই ঐক্য অনুভব করাতেই তাঁর আনন্দ। মোহিতলালের কাছে বস্তুর সত্য রূপ হল বস্তুর কাব্য রচিত রূপ সমগ্রতা। তাঁর তত্ত্বে ক্রমশ কবি কল্পনার আত্মভাব নিরপেক্ষতা স্বীকৃত হবার ফলে কোন বস্তুর আত্মভাবানুরূপ রূপ রচনার গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে। সাহিত্য তাঁর কাছে নিজের মনের মত করে জগৎকে দেখা নয় বরং জগৎকে তদনুরূপ করে দেখা ও দেখানো। মোহিতলালের সৃষ্টিতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক কাছাকাছি। বাস্তবের গভীরতর কে ব্যক্ত করবার ধারণা রোম্যান্টিকদের এবং সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথেরও। মোহিতলাল যখন বলেন :

> সাহিত্যের প্রধান আখ্যা এই যে তাহা মানুষেরই আত্মকাহিনী, জগতের উপর আপনাকে প্রসারিত করিয়া আপনাকেই আপনি দেখার যে অপূর্বভঙ্গি তাহাই সাহিত্য সৃষ্টি সর্বস্ব।[১৪২]

তখন রোমান্টিকদের সঙ্গে তাঁর গোত্র সম্পর্ক অনুধাবন করতে অসুবিধে হয়না। তবু আত্মোপলব্ধির এই তত্ত্ব মোহিতলাল শেষপর্যন্ত স্বীকার করেননি। আত্মোপলব্ধি ও আত্মভাব নিরপেক্ষতা এই দুই ধারণাই তাঁর লেখায় পাশাপাশি চলেছে শেষ পর্যন্ত বড় হয়েছে নিরপেক্ষ দৃষ্টির ধারণা। এদিক থেকেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সূত্র নির্দেশিকা ও টীকা

১. David Daiches. Critical Approaches to Literature. Orient Longman 1989, p 171.

২. Renewellek and Austin Warren, Theory of Literature, Penguin 1985 p 39-40.

৩. সত্যেন্দ্র নাথ রায়, সাহিত্য সমালোচনায় বংকিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ, সারস্বত লাইব্রেরী ১৩৮১ পৃ ৬০

৪. সাহিত্যের পথে গ্রন্থের ভূমিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।২৯১

৫. ঐ

৬. ঐ

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. সাহিত্যের স্বরূপ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৫০৯

১০. আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৩৪৮

১১. সাহিত্যের স্বরূপ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৫১১

১২. সাহিত্যের উদ্দেশ্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩।৮২৮

১৩. কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, প্রাচীন সাহিত্য রবীন্দ্র রচনাবলী ১৩।৬৬২

১৪. আধুনিক সাহিত্য গ্রন্থের ভূমিকা

১৫. ভারতী পত্রিকায় লেখা নিবন্ধগুলির শিরোনাম

পৌষ ১৩২৬ - সত্য শিব সুন্দর, এ যুগের সমস্যা, আর্টসাধনা, কবি ও ক্রিটিক

মাঘ ১৩২৬ - সুন্দর বিজ্ঞান, সুন্দর মঙ্গল, আসল কথা, আদি রহস্য, ভারতীয় সাধনা সত্যসুন্দর ও রবীন্দ্র নাথের সাহিত্য সাধনা, সত্যসুন্দর বনাম বস্তুতন্ত্র, রবীন্দ্রনাথের আর্ট।

ফাল্গুন ১৩২৬ - সুন্দর দর্শন, সুন্দর চেতনা বা রস পরিচয়, সুন্দর জিজ্ঞাসা অলংকার শাস্ত্র ও রস, মতবাদের অসম্পূর্ণতা

চৈত্র ১৩২৬ - নিম্নাধিকারের কথা, মনোবিজ্ঞান ও রসতত্ত্ব, সুন্দর সংবেদনায় স্বভাব ও আর্ট। রসতত্ত্বের পুনর্বিচার ও অধিকারভেদ, মধ্যম রস-বোধ, সুন্দর রহস্য, রসোৎপত্তি নির্ণয়ে কবিদের সাক্ষ্য

১৬. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৫

১৭. ভারতী ফাল্গুণ ১৩২৬ পৃ ৯১৩

১৮. ঐ

১৯. ঐ মাঘ পৃ ৮১৩

২০. চৈত্র পৃ ৯৭৪

২১. ভারতী ফাল্গুণ ১৩২৬ পৃ ৯১৪

২২. ভারতী চৈত্র ১৩২৬ পৃ ৯৯৮

২৩. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৯

২৪. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৪

২৫. ঐ পৃ ৮১৪

২৬. ঐ পৃ ৮১৩

২৭. মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৬

২৮. পৌষ ১৩২৬ পৃ ৭৫৫

২৯. মাঘ পৃ ৮১৪

৩০. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৪

৩১. ঐ পৌষ ১৩২৬ পৃ ৭৫৪

৩২. ঐ মাঘ পৃ ৮১৪

৩৩. ঐ ফাল্গুন পৃ ৯১০

৩৪. ঐ পৃ ৯১১

৩৫. ভারতী ফাল্গুন পৃ ১১১

৩৬. সাহিত্য কথা বঙ্গভারতী গ্রন্থালয় ১৩৬৬ ভূমিকা পৃ

৩৭. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার, বিদ্যোদয় পৃ ১

৩৮. ঐ পৃ ১

৩৯. ঐ পৃ ১

৪০. ঐ পৃ ৩

৪১. ঐ পৃ ১০

৪২. কাব্য ও জীবন সাহিত্য বিচার পৃ ৪৭

৪৩. ঐ পৃ ৪৭

৪৪. কবি ও কাব্য সাহিত্য বিচার পৃ.৬

৪৫. সাহিত্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার পৃ. ১১২, কবি ও কাব্য প্রবন্ধে Fancy কে কাল্পনিক বলেছেন imagination কে স্পষ্ট করে না বলেও কল্পনার অর্থে ব্যবহার করেছেন। সাহিত্য বিচার ২১

৪৬. ঐ

৪৭. কবি ও কাব্য সাহিত্য বিচার পৃ ৩৬

৪৮. সাহিত্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার ১১১

৪৯. ঐ

৫০. কবি ও কাব্য সাহিত্য বিচার পৃ ১৮

৫১. ঐ

৫২. ঐ পৃ ৩৩

৫৩. ঐ পৃ ৩৬

৫৪. ঐ পৃ ৩৬

৫৫. ঐ পৃ ৩৭

৫৬. ঐ পৃ ৪০

৫৭. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৪০

৫৮. ঐ পৃ ৩৯

৫৯. ঐ পৃ ৩৯

৬০. কাব্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার পৃ ৪৮

৬১. সাহিত্য জীবন, সাহিত্য বিচার পৃ ১১১

৬২. সাহিত্যের সুরাজ, সাহিত্য কথা পৃ ৮৪

৬৩. ঐ পৃ ৮৫

৬৪. সাহিত্য বিচার, সাহিত্য বিতান বিদ্যোদয় ১৯৭৪ পৃ ৩

৬৫. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৬

৬৬. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৭

৬৭. ঐ পৃ ৭

৬৮. ঐ পৃ ৭

৬৯. ঐ পৃ ৭

৭০. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৪

৭১. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ২

৭২. ঐ ঐ পৃ ৪

৭৩. ঐ ঐ পৃ ৪

৭৪. ঐ ঐ পৃ ২৩

৭৫. কাব্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার পৃ ৪৭

৭৬. ঐ পৃ. ৪৭

৭৭. ঐ পৃ ৪৭

৭৮. ঐ পৃ ৪৮

৭৯. সাহিত্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার ১১৩

৮০. সাহিত্যের সুরাজ, সাহিত্য কথা, বঙ্গ ভারতী গ্রন্থালয় ১৩৬৬, পৃ ৮৮

৮১. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য বিতান পৃ ১১

৮২. ঐ ঐ পৃ. ১১৬

৮৩. ঐ ঐ পৃ. ১১৯

৮৪. ঐ ঐ পৃ. ১২১

৮৫. সাহিত্য বিচার সাহিত্য বিতান পৃ ১১

৮৬. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৪

৮৭. সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্য কথা পৃ ৭

৮৮. ঐ পৃ.৯

৮৯. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য কথা পৃ ১১০

৯০. বন্ধনীধৃত বাক্যাংশ আমার, মোহিতলালেরই বাক্য-বন্ধের ব্যবহার মাত্র

৯১. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য কথা পৃ.১১২

৯২. ঐ পৃ ১১৮

৯৩. ঐ পৃ ১১৫

৯৪. ঐ পৃ ১১৬

৯৫. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৪

৯৬. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৫

৯৭. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য কথা পৃ ১১৯

৯৮. ঐ ঐ পৃ ১২২

৯৯. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ১

১০০. সাহিত্যে অশ্লীলতা, সাহিত্য কথা পৃ ১৬৭

১০১. ঐ পৃ ১৬৫

১০২. সাহিত্যবিচার, সাহিত্য বিতান বিদ্যোদয় ১৯৭৪ পৃ ১৪

১০৩. ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পৃ ৬৭২

১০৪. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৩৭

৮১. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য বিতান পৃ ১১

৮২. ঐ ঐ পৃ. ১১৬

৮৩. ঐ ঐ পৃ. ১১৯

৮৪. ঐ ঐ পৃ. ১২১

৮৫. সাহিত্য বিচার সাহিত্য বিতান পৃ ১১

৮৬. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৪

৮৭. সাহিত্যের আদর্শ, সাহিত্য কথা পৃ ৭

৮৮. ঐ পৃ.৯

৮৯. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য কথা পৃ ১১০

৯০. বন্ধনীধৃত বাক্যাংশ আমার, মোহিতলালেরই বাক্য-বন্ধের ব্যবহার মাত্র

৯১. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য কথা পৃ.১১২

৯২. ঐ পৃ ১১৮

৯৩. ঐ পৃ ১১৫

৯৪. ঐ পৃ ১১৬

৯৫. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৪

৯৬. ভারতী মাঘ ১৩২৬ পৃ ৮১৫

৯৭. সাহিত্যে সুনীতি, সাহিত্য কথা পৃ ১১৯

৯৮. ঐ ঐ পৃ ১২২

৯৯. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ১

১০০. সাহিত্যে অশ্লীলতা, সাহিত্য কথা পৃ ১৬৭

১০১. ঐ পৃ ১৬৫

১০২. সাহিত্যবিচার, সাহিত্য বিতান বিদ্যোদয় ১৯৭৪ পৃ ১৪

১০৩. ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৬ পৃ ৬৭২

১০৪. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৩৭

১০৫. সৃষ্টি, সাহিত্যের পথে রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৩২৩

১০৬. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ৪৬

১০৭. সাহিত্যের ছোট ও বড়, সাহিত্য কথা পৃ ৫৪

১০৮. রস ও রূপ, সাহিত্যকথা পৃ ৬২

১০৯. ঐ পৃ ৬২

১১০. সাহিত্য বিচার, সাহিত্য বিতান পৃ ২

১১১. ঐ পৃ.৪

১১২. ঐ পৃ ৭

১১৩. ঐ পৃ ৭

১১৪. ঐ পৃ ৭

১১৫. রস ও রূপ, সাহিত্য বিচার পৃ ৬৪

১১৬. ঐ পৃ ৬৬

১১৭. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার পৃ ১৮

১১৮. ঐ পৃ ৩৯

১১৯. ঈশ্বর গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব, বংকিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খন্ড দ্বিতীয় অংশ সাফরতা প্রকাশন ১৯৭৩ পৃ ১১৫৭

১২০. কবি ও কাব্য, সাহিত্য বিচার ৪

১২১. ঐ পৃ ৩৯

১২২. ধর্ম ও সাহিত্য, বিবিধ প্রবন্ধ, বংকিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধখন্ড প্রথম অংশ, সাফরতা প্রকাশন ১৯৭৩ পৃ ৩২৭

১২৩. ঐ

১২৪. অনুকরণ, বিবিধ প্রবন্ধ, ঐ পৃ.২৫১

১২৫. কাব্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার পৃ.৪৭

১২৬. উত্তর চরিত, বিবিধ প্রবন্ধ, ঐ পৃ

১২৭. ধর্ম ও সাহিত্য বিবিধ প্রবন্ধ, পৃ ৩৩০

১২৮. ঐ পৃ ৩৩২

১২৯. ভারতী পৌষ ১৩২৬ পৃ ৫৪

১৩০. কাব্য ও জীবন, সাহিত্য বিচার, পৃ ৪৭

১৩১. ঐ পৃ ৪

১৩২. ঐ পৃ ৫

১৩৩. সাহিত্যরূপ, সাহিত্যের পথে রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৩৯৬

১৩৪. সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্যের পথে ঐ পৃ ৩২৩

১৩৫. সাহিত্যের ছোট ও বড়, সাহিত্যকথা পৃ ৫৫

১৩৬. ঐ পৃ.৪৯

১৩৭. T.E. Hume Romanticism, In David Lodge(ed)., 20th Century Literary Criticism, Longman, 1988 p.94.

১৩৮. পত্রগুচ্ছ পৃ ৮৫

১৩৯. সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যের পথে রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৩৫৪

১৪০. রূপশিল্প ঐ রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪।৪২৮

১৪১. সাহিত্যের ছোট ও বড় সাহিত্য কথা পৃ ৪৯

এই ধারণার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের সামগ্রী প্রবন্ধের মতের মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে বলেছিলেন "রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থ রূপে বাঁচিয়া থাকে ভাবের মধ্যে নহে বিষয়ের মধ্যে নহে।" ১৩।৭৪৩

১৪২. নিত্য ও সাহিত্য, সাহিত্য কথা পৃ ১৫